ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক

প্রভাত রায়ের রচনা সংগ্রহ ও স্মৃতিকথা

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক

প্রভাত রায়ের রচনা সংগ্রহ ও স্মৃতিকথা

সম্পাদনা

নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা　গৌতমী রায় চিরান　কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী

হাসি রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক
প্রভাত রায়ের রচনা সংগ্রহ ও স্মৃতিকথা

Prabhat Roy, a pioneer of the democratic movement in Tripura ; collection of writings and memoirs

প্রথম প্রকাশ
আগরতলা বইমেলা, ২০০২

প্রকাশিকা
হাসি রায়, কর্ণেল বাড়ি, কৃষ্ণনগর, আগরতলা - ৭৯৯০০১

বিন্যাস-মুদ্রণ
কম্পিউট, আগরতলা

মূল্য দুইশ পঞ্চাশ টাকা

যে অগণন মানবের হিতে
প্রভাত রায় নিজেকে উৎসর্গ
করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

ভূমিকা

তিরিশ দশক ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সর্বাধিক আলোড়ন-তোলা দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই দশকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এক ব্যাপক জাতীয় জাগরণে পরিণত হয়। আপাতদৃষ্টিতে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' যে বাস্তবিক অর্থে একটি তোষামোদকারী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল তা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ নাগরিকদের বুঝতে অসুবিধে হত না। ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এই সম্পর্কে যে মন্তব্য উল্লিখিত হয়েছে তা অনুধাবনযোগ্য।

'... The independent states of Tripura was recognised though independencc was qualified by the British as being subject to the recognition of the British as the paramount power by each successive ruler.'

এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণেই ত্রিপুরার মহারাজাদের ব্রিটিশ সরকারের নীতিসমূহের বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব ছিল না, বা ত্রিপুরার ভূখন্ডকে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিতে অস্বীকার করতেন। যারা ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিতেন তাদের রাজকোষ এড়িয়ে চলতে হত। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহারাজা এদের প্রতি যে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেখাতেন তা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মহারাজার সম্পর্কের ভঙ্গুরতা নির্দেশ করে।

স্বাধীন ত্রিপুরার কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা যাই হোক না, এখানে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার কোন প্রেক্ষাপট ছিল না। তিরিশের দশকের শুরুতে যুগান্তর ও অনুশীলন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা বেশ কয়েকটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গোপন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও অসহযোগ অন্দোলনে সহযোগিতা করার আবেদন জানিয়ে বেশ কিছু গোপন সভা-সমিতির খবর ব্রিটিশ সরকারের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তারা এই 'স্বদেশী'দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহারাজাকে 'অনুরোধ' করে এবং মহারাজা স্বদেশীদের দমনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩০ সালে প্রভাত রায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম হয়ে পড়তে যান কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে। এই স্বাধীনচেতা যুবক অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেকে নিবেদিত করেন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে সশস্ত্রবাদের পথ বেছে নেন ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত এই সমিতির গোপন কর্মক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রাজন্য ত্রিপুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'অমরসুধা' ডাকাতির ঘটনায় ধৃত রাজনৈতিক সহকর্মীদের ছিনিয়ে আনতে একটি পিস্তলের প্রয়োজন হয়। প্রভাত রায় নিজের মামা সোনামুড়ার বিভাগীয় হাকিম ললিতমোহন দেববর্মার পিস্তলটি চুরি করান তাঁরই মামাতো বোন অমিয়াকে দিয়ে। পিস্তলটি পাচার করার সময় সহযোগীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। তারপর অমিয়াকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে গোপন চিঠি তিনি লিখেছেন, তা পুলিশের হাতে পড়ে যায় এবং প্রভাত রায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩১-৩৫ তিনি ব্রিটিশ কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেখান থেকেই বি এ পাশ করেন।

জেলে থাকার সময় যে সব পড়াশুনো করেছেন বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পরই ধারণা হয় প্রভাত রায় সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেন। তাঁরই লেখা 'ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের ইতিহাস' শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন 'সবুজ সমিতি' প্রথম ত্রিপুরার গণআন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তুলতে কাজ শুরু করে। বলা বাহুল্য, এই সমিতির পত্তন করেছিলেন প্রভাত রায়।

১৯৩৮ সালে গড়ে ওঠে ত্রিপুরার প্রথম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন জনমঙ্গল সমিতি। এর নেতৃত্বে ছিলেন প্রভাত রায়, অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশী ঠাকুর), গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ। মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুরকে কারান্তরালে নিক্ষেপ করেন এবং এঁদের অনুগামীদের উপর নামিয়ে আনেন দমনপীড়ন। জনমঙ্গল সমিতির কার্যকলাপে অংশ নেবার জন্য বীরেন দত্ত, নিমাই দেববর্মা এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর কারাবাস হয়। প্রভাত রায় কারাগার থেকেই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই সময় মহারাজা বীরবিক্রম নিজে রাজপরিবারের এই বিচক্ষণ ব্যক্তিটির সঙ্গে কারাগারে দেখা করেন, তাঁকে রাজকার্যে সহযোগিতার আবেদন জানান। প্রভাত রায় মহারাজাকে বলেন, রাজকার্যে তাঁর কোন উৎসাহ নেই, তবে প্রজামঙ্গলে যদি মহারাজা কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন তবে তাতে তিনি সহযোগিতা করবেন। তাঁর নিজের ভাবনাগত অবস্থানের দৃঢ়তা এবং স্বচ্ছতা এই দৃষ্টান্ত থেকে সূচিত হয়।

১৯৪৬ সালে প্রভাত রায়ের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন মতবাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের একটি সাধারণ অবস্থানে সমাবিষ্ট করতে গড়ে ওঠে প্রজামন্ডল। প্রজামন্ডলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীরেন দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বংশী ঠাকুর, কানু সেনগুপ্ত, গোপেশ্বর দেববর্মা, বীরচন্দ্র দেববর্মা, বাদশা মিঞা প্রমুখ। প্রজামন্ডলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে প্রভাত রায় লিখেছেন,

> 'জাতীয় মনোভাব গড়িয়া তুলিতে প্রজা-অপ্রজা কথার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে। দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র পাইলে প্রজারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কে শোষক তা চিনিয়া সংগ্রাম করিতে পারিবে। আমলাতন্ত্রকে আঘাত করাই হইল অপ্রজাকে আঘাত করা। আমলাতন্ত্র কাতর হইয়া পড়িলে প্রজাশক্তিই জয়ী হইবে।'

প্রজামন্ডল দায়িত্বশীল সরকারে আওয়াজ তুলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কামান দাগতে শুরু করে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবধারার গণতান্ত্রিক শক্তির সহাবস্থানের ফলে প্রজাদের মধ্যে এক গভীর প্রত্যয় জন্ম নেয়। এই আন্দোলনের প্রতি মহারাজার অসহিষ্ণুতা যতই প্রকাশ্য হতে থাকে ততই আঘাত আসতে থাকে। প্রজামঙ্গলকে কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল তা ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজাকে লিখিত জওহরলাল নেহরুর একটি চিঠি (ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৫) থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

> 'আমি আরও জানতে পেরেছি যে, ১৯৪০-এর আরম্ভ থেকেই সমস্ত সভা ও মিছিল এবং অন্যান্য বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোনপ্রকার নাগরিক

স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। আমি আশ্চর্য হই যে, আজকের ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের ঘটনাবলীতে এমন অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে।'

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে জারী হওয়া নিষেধাজ্ঞা ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ খানিকটা শিথিল হয়। এদিকে 'জনশিক্ষা সমিতি' প্রজামন্ডলের রাজনৈতিক দাবীকে সমর্থন জানানোয় প্রজামন্ডলের আন্দোলনে গতিবেগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে ১৯৪৬ সালে মহারাজার বিদেশ ভ্রমণের পর এসে ঘোষণা করলেন তিনি একটি 'দায়িত্বশীল সরকার' গঠন করবেন। তবে নেয়া হবে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধি। এর ফলে তীব্র দক্ষিণপন্থী এবং রাজানুগতরাই আনুকূল্য পাবেন। কিন্তু এই ঘোষণা কার্যকর করার আগেই মহারাজার আকস্মিক মৃত্যু হয়। রাজতন্ত্র এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এক জটিল আবর্তে পড়ে। তখনই ত্রিপুরার গণআন্দোলনের দুইটি ধারা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জঙ্গী গণপ্রতিরোধ এবং উদার গণতন্ত্রবাদী কংগ্রেসের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল সরকারের আন্দোলন তীব্র হয়। ২৬ জুন, ১৯৪৮ সালে গ্রেপ্তার হন প্রভাত রায়, বীরেন দত্ত, বংশী ঠাকুর, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

কারামুক্তির (১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮) পব ১৯৪৯ সালে প্রভাত রায় প্রকাশ করেন 'চিনিহা'। এমন সুসম্পাদিত পত্রিকা বোধ হয় প্রভাত রায়ই সম্পাদনা করতে পারেন। এই সংগ্রহে তারই নিদর্শন পাঠকদের বিস্মিত করবে। ১৯৫১ সালে ত্রিপুবার ভারতভুক্তির পর গণতান্ত্রিক শক্তির একটি ঐক্যবদ্ধ চেহারা দেবার তারই নেতৃত্বে গঠিত হয় ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘ। ১৯৫২ সালে এই গণতান্ত্রিক সংঘের সঙ্গে আঁতাত হয় কমিউনিস্ট পার্টির। এর ফলে এই জোটের বিপুল জয় সূচিত হয়। লোকসভার দুইটি আসন এবং ইলেক্টোরাল কলেজের ১৭টি আসন এই জোটের দখলে যায়। কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে দীক্ষিত প্রভাত রায়ের সঙ্গে কমিউনিস্ট নীতিগত মতান্তর ছিল, পরবর্তী সময়ে তা অনিবার্য বিচ্ছেদ ডেকে আনে। তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তবুও কংগ্রেসের ভুল পদক্ষেপ এবং জনবিরোধী-প্রবণতা সম্পর্কে ছিলেন সমালোচনা মুখর। চিনিহা-র পাতায় সে ইতিহাস বিধৃত আছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কুৎসার তিনি বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন। যে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য তিনি কাজ করেছিলেন সংকীর্ণ এবং স্বার্থান্ধ ক্ষমতামুখী রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে এই মানবিক ও গণতান্ত্রিক তৃতীয় ধারাটি ভ্রষ্ট হয়। প্রভাত রায়কে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তাধারা প্রভাবিত করেছিল বলেই মনে হয়। 'চিনিহা'য় মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত নিবন্ধ এই পর্যবেক্ষণের সূচক বলে মনে হয়।

১৯৫৬ সালে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত প্রভাত রায় নিরন্তর শুধু প্রজামঙ্গলের জন্য বহুবিধ রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাজকর্মই সংঘটিত করেননি, তিনি নিভৃতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন যার রোমান্টিকতা আমাদের আবিষ্ট করে। এছাড়া বহু সৃজনাত্মক কর্মোদ্যমে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশ্লেষণ করেছেন সমাজ এবং রাজনীতিকে। সন্নিষ্ঠভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ এবং মানব উন্নয়নের

পথরেখা সন্ধান করেছেন। এই রচনা সংগ্রহ কিন্তু একটি অনিবার্য প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে — কেন তবুও প্রভাত রায় ইতিহাসে উপেক্ষিত? এই ইতিহাসচর্চা তবে কতটা বস্তুনিষ্ঠ? এই অনুসন্ধিৎসার সার্বিক বিবেচনার ভার ছেড়ে ছিলাম গবেষক ও পাঠকদের হাতে। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক প্রভাত রায়ের রচনা সংগ্রহ ও স্মৃতিকথা যদি স্বার্থান্ধ রাজনীতিতে মৃদু আঘাত করতে পারে তবেই এই যৌথ প্রয়াস সার্থক হবে।

নিবেদন

বহুদিন পূর্বেই আমার স্বামী তৎকালীন বিশিষ্ট জননেতা ও 'চিনিহা'র সম্পাদক প্রয়াত প্রভাত রায়ের স্বহস্তে লিখিত সাহিত্য, পত্রপত্রিকা, সংগ্রহ, রাজনীতিমূলক তথ্যাদি বই হিসাবে প্রকাশ করার খুব ইচ্ছে ছিল। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে আজ আমি একটা পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। ছেলে-মেয়েরা আজ প্রতিষ্ঠিত। এদের মাধ্যমেই আমি আমার আশা পূর্ণ করতে চলেছি। আমার ৭৫ বছর বয়সে, জীবনে এই পূর্ণতাই সবচাইতে বড়।

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে গেলে প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুরের কথা স্বভাবতঃ উল্লেখ করতে হয়। ত্রিপুরার আন্দোলন ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক বিশিষ্ট গুণিজনদের লেখা আমি পড়েছি। তাঁদের রচনাতে প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুরের কথা কিছু না কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রভাত রায়ের স্বহস্তে লিখিত পত্রপত্রিকা, তথ্য, সাহিত্য ইত্যাদি বই আকারে প্রকাশিত হলে তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারা সঠিকভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরা যাবে বলে আশা করি।

বহু আগে প্রয়াত মণিময় দেববর্মাও এগিয়ে এসেছিলেন প্রয়াত রায়ের রচনা সম্ভার প্রকাশ করার প্রচেষ্টায়। তথ্যের কিছু অংশও নিয়ে গিয়েছিলেন। যাক্ সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

সম্প্রতি এ রাজ্যের প্রবীণ সংগ্রামী, যাঁরা প্রভাত রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের এবং বিভিন্ন গুণিজনদের কাছে থেকে প্রভাত রায় রচনা সংকলন এবং তাঁকে নিয়ে বই প্রকাশের ব্যাপারে স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যাপারে স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন রাজ্যের আলোকচিত্রী সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রবীন সেনগুপ্ত।

সম্পাদনার দায়িত্বভার নিয়েছেন আকাশবাণী আগরতলার কেন্দ্র অধিকর্তা ও রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌতমী রায় এবং ভাষা গবেষক শ্রীযুক্ত কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী। গ্রন্থের নামকরণ, অধ্যায় সূচী গ্রহণ এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীশুভাশিস তলাপাত্র, শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য। বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার টেপে সংগ্রহ, অনুলিখন, প্রুফ সংশোধন ও আনুসঙ্গিক কার্য্যে সহায়তা করেছে আমার মেয়ে, জামাতা ও নাতিরা — রাখী দেববর্মা, ত্রিদিবকৃষ্ণ দেববর্মা, প্রান্তীশ চিরান, দিগ্বিজয় কৃষ্ণ ও জন দেববর্মা।

এই অমূল্য গ্রন্থ, যা নাকি রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের দলিল হিসেবে ইতিহাসের বহু অনাস্বাদিত চিত্রকে সুপরিস্ফুট করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। এর প্রকাশনায় আরও বহুভাবে যারা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, তাঁদের সবার জন্য রইল আমার অন্তরের গভীর ও অনন্ত কৃতজ্ঞতা।

হাসি রায়

অধ্যায় ১

"যারা আপনারে দিয়াছে বিলায়ে বিশ্বমাঝে
বৃহত্তম পথে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়র কাছে
যারা রহে নাই আপনারে লয়ে সতত
সকলের তরে যারা সদা রহে বিব্রত
বরণীয় তাঁরা হৃৎনভে স্মরণীয়
সব চলে যাক্, তবু তাঁরা চিরপ্রিয়।"

ঁপ্রভাত রায়
২৫/১১/৪৪ ত্রিং।

ত্রিপুরা রাজবংশ সম্ভুত স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায়ের তৃতীয় পুত্র ঁপ্রভাত রায় আগরতলা কৃষ্ণনগরে ১৯১৪ সালে ২৬শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় প্রতাপ রায়ের বংশাবলী ত্রিপুর "রাজমালা" পুস্তকের শেষাংশে সংযোজিত আছে এবং উহাতে ঁপ্রভাত রায়ের নাম ও উল্লিখিত আছে। মাতা হরসুন্দরী দেবীর পিতার নাম স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর যিনি ত্রিপুরী ভাষায় বই "ককবরকমা ও ত্রিপুরী ভাষার ব্যাকরণ (ককবরক সুরুংমা) লিখে ত্রিপুরাবাসীর নিকট সুপরিচিত। প্রভাত রায়ের কৃষ্ণনগরস্থ বাসভবন বর্তমানে ত্রিপুরা জজকোর্ট ষ্টাফ আবাসিক হিসাবে পরিগণিত। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা কৃষ্ণনগর কর্ণেল বাড়ীতে বসবাস করছেন।

শৈশবে বিজয়কুমার স্কুলে তাঁর পাঠ্যজীবন শুরু। তারপর ঠাকুর বোর্ডিং-এ থেকে উমাকান্ত একাডেমীতে পড়াশুনা করেন। ছোটবেলা থেকেই ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। আবার দুরন্তপনারও সীমা ছিল না। শৈশবের সেই দুরন্তপনার ভিতরেই যেন লুকিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যতের অসামান্য প্রতিভাগুলি। এর কিছুটা অনুমান করা যায় তাঁর লেখা ছোটবেলার গল্প "হরবন সিং"-এ। এবং আসল কথা ও আদৎ কথা" প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, "আমি যখন ছেলেবেলায় স্কুলে ভরী দৌরাত্ম্য করিতাম তখন ক্লাশের চতুর শিক্ষকটি আমারই উপর মণিটারী চাপাইয়া দিতেন ফলে আমাকে বাধ্য হইয়াই চুপ থাকিতে হইত। আর তখন আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া বয়স্থঃ ছাত্রেরা পর্য্যন্ত তটস্থ হইত।"

যুবক বয়সে "ছাত্র সংঘের" সদস্য ছিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম, লাঠিখেলা, কুস্তি চর্চা করতেন। নিজের বাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণায় কুস্তি খোলায় আগরতলার বন্ধু প্রতিম যুবকদের সাথে কুস্তি খেলতেন এবং অন্যান্য ব্যায়াম ও করতেন। তখনকার দিনে কোমরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে চলন্ত ট্যাক্সি আটক করে রাখতেন এবং দর্শকদের বাহবা কুড়াতেন। প্রবাদ আছে, দিনের সকল বৈশিষ্টাই প্রত্যুষের ভ্রূণের মধ্যে নিহিত থাকে। ছোটবেলায় তাঁর কোনো কিছু জানা বা শোনার কৌতূহল ছিল প্রবল। সেই জানার আগ্রহ বা কৌতূহলই তাঁকে পরবর্তী জীবনে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মা বাবা ও গুরুজনদের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং ভাই বোনদেব প্রতি স্নেহপরায়ণ। ১৯৩৪ সালে জেলে অন্তরীণ থাকাকালীন মা হরসুন্দরীকে এক চিঠিতে লিখেছেন,

"তোমার স্নেহের শাসন ও নিভৃত শিক্ষা আজ আমাকে মনুষ্যত্ব লাভের পথে পরিচালিত করিতেছে। মানুষ গড়াতে মায়ের প্রভাব যে কী অসামান্য তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছি।" সেই জন্য আমি সর্বতোভাবে সকলের জন্য মাতার আশীর্বাদ, স্নেহ, শাসন শিক্ষায় বিশ্বাস করি। "ঠাকুর বোর্ডিং-এ প্রবীর, ব্রজা পড়িতেছে। এমন সুযোগ ও সুবিধা যদি তাহারা অবহেলা করে তবে দ্বিতীয়বার তাহা ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা মনযোগ সহকারে লেখাপড়া করুক।" একমাত্র বোনের সম্পর্কে লিখেছেন "যে আদর্শ নারীর চিত্র আমি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া থাকি, কল্যাণীর মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি।" তাকে ঘরের কাজ শিখায়ো কিন্তু দাসী হইতে যেন না শিখে।" ১৯৩০ সালে উমাকান্ত একাডেমী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এবং তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত পূর্ব বাংলায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন। তখন ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য গুপ্ত আন্দোলন চলছিল। প্রভাত রায় ও 'অনুশীলন সমিতি' নামে এক সংগঠনে সামিল হয়ে গুপ্ত আন্দোলনে যুক্ত হন। অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত আরও যারা ছিলেন তারা হলেন অনন্ত দে, সুশীল দেববর্মা, বীরেন দত্ত, শচীন সিং, জিতু দত্ত ও প্রেমাংশু চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত আরও অনেকে। কান্তি দেববর্মা ও সুশীল দেববর্মা প্রভাত রায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। এক ঐতিহাসিক রিভলবার চুরির ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে শ্রদ্ধেয় সি পি আই নেতা অঘোর দেববর্মা লিখিত "ত্রিপুরায় কমিউনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর" বই থেকে নেওয়া হয়েছে। সীমা রায় লিখিত "অগ্নিযুগের কাহিনী" বই থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

ইংরেজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে "অমরসুধা' ডাকতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন যদু ভট্টাচার্য, বীরেন ভট্টাচার্য, শচীন দত্ত, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, পবিত্র পাল প্রমুখ। এই 'অমরসুধা' ডাকতিতে ধৃত আসামীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য একটি পিস্তলের দরকার হয়ে পড়ে। প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মা (এম এ বি এল) প্রভাত রায়ের ছোট মামা সোনামুড়া বিভাগীয় হাকিম ছিলেন। তাঁর বড় মেয়ে অমিয়া দেবী। প্রভাত রায় মামার পিস্তলটি অমিয়া দেববর্মাকে দিয়ে চুরি করান কান্তি দেববর্মা মারফৎ। কান্তি দেববর্মা পিস্তলটি নিয়ে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কুমিল্লার দিকে রওনা হন। পথে প্রচন্ড বর্ষা, গোমতী নদীর জল থৈথৈ, বিপজ্জনক অবস্থায়, খেয়াঘাটের মাঝিরাও নৌকা পারাপার বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু কান্তি দেববর্মা ছিলেন দুঃসাহসী, নির্ভীক, দেশপ্রেমিক, তিনি উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত নদী পার হয়ে নির্ধারিত স্থানে এসে পৌঁছলেন এবং অনন্ত দের হাতে পিস্তলটি তুলে দেন। এদিকে সাদা পোশাকে পুলিশ ওৎপেতে বসেছিল। দু'জনেরই পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দু'জনেই গ্রেপ্তার হন। অনন্ত দে পুলিশকে মারার জন্য তাক করেও ব্যর্থ হন এবং পিস্তলটি ড্রেইনে ছুঁড়ে ফেলে দেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে সেটি তুলে নেয়। ধরা পড়ে কান্তি দেববর্মার ওপর প্রচন্ড দৈহিক নির্যাতন শুরু হলো। এমনকি পাঁচ আঙ্গুলে সূচ ঢুকিয়ে শাস্তি প্রদান করা হলো। তবু তিনি ঘটনা সম্পর্কে বৃটিশ পুলিশের কাছে নতি স্বীকার করেননি। এদিকে এই খবর পেয়ে প্রভাত রায় বার্তা জানিয়ে সুশীল দেববর্মার মারফৎ অমিয়াদিকে এক চিঠি লিখে পাঠান। এই চিঠি সহ সুশীল দেববর্মাও কুমিল্লা রেল স্টেশনে ধরা পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত রায়ও গ্রেপ্তার হন।

তখন ললিত মোহন দেববর্মা (বিভাগীয় হাকিম) পরিবার পরিজন সহ হাতীর পিঠে চড়ে জঙ্গল পার হয়ে আগরতলায় চলে আসেন। এই ঘটনার জন্য অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। অমিয়া দেবী ও পরে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এবং মারা যান। প্রয়াত ললিত মোহন দেববর্মা ভাগনের এই দুঃসাহসীক কীর্তি অনেকদিন পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারলেন না। তবু স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে এদের আত্মত্যাগের কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাজ্যবাসী প্রজা প্রভাত রায় ও অন্যান্যদের ভারতের স্বধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেলে আটক হওয়া বিচার সাপেক্ষ। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা হিসাবে বিষয়টি নিয়ে কুমিল্লা বৃটিশ রেসিডেন্ট কমিশনারের সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের অনেক লিখালিখি হয় এবং তাদের আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ রাখাই সাব্যস্ত হয়। পরে দেখা যায় প্রভাত রায়ের বিরুদ্ধে রিভলবার চুরির কোন কেইস দায়ের করা হয়নি। বৃটিশ আন্দোলনে যুক্ত বলেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৯৩১ সাল থেকে একটানা ৫ বৎসর যাবৎ অন্তরীণ অবস্থায় প্রভাত রায় ১৯৩৬ সালে ডিষ্টিংশনে বি এ পাশ করেন। পাঠ্য বই ছাড়াও আউট বই পড়া তাঁর বরাবরই অভ্যাস ছিল। জেলে বসে বিভিন্ন বড় বড় লেখকের বই পড়ে সময় কাটাতেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুল প্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র লাল, শেলী, কীটস্, বায়রণ প্রমুখের লেখা তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারা জীবনে দিনের পর দিন একা তাই তাঁর খেলাধূলা, সাথী সান্ত্বনা, হাসি, অশ্রু বলতে বই-ই সম্বল ছিল। তাছাড়া সাহিত্যের প্রতি তিনি প্রবল অনুরাগী ছিলেন। প্রথমবার কারাজীবনে লিখেছেন বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ গান, সমালোচনা ইত্যাদি। তবে তাঁর লেখার সূচীপত্র অনুযায়ী আমরা তার সহধর্মিনী শ্রীমতী হাসি রায়ের কাছ থেকে যতটুকু পেয়েছি ততটুকুই এই বইয়ে প্রকাশ করেছি। শ্রীমতী রায় যতটুকু সাধ্য স্বামীর অবদানের সম্বলগুলি সযত্নে রেখেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হিসাবে তুলে ধরতে। প্রয়াত ঠাকুর প্রভাত রায় সম্পর্কে বা তাঁর নিজের লেখা প্রকাশ করতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি কারণ তিনি স্পষ্টভাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখাগুলিতে দিন তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ রেখেছেন। তবুও আমাদের অনভিজ্ঞতা বা না বোঝার জন্য লেখার ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়ে থাকলে পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনীয়। প্রয়াত প্রভাত রায়ের লেখা "ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের ইতিহাস" প্রবন্ধে পাওয়া যায় ত্রিপুরায় গণ আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি 'সবুজ সমিতি।' তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে সবুজ সমিতি গঠন করেন এবং বাড়ী বাড়ী মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করতেন এবং সংগৃহীত চাউল বিক্রি করে গরীব ছাত্রদের বই কেনার ব্যবস্থা করতেন। তিনি নিজেই গরীব ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্রদের জন্য কোচিং ক্লাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর ১৯৩৮ সালে (১৩ই ভাদ্র ১৩৪৮ ত্রিং) সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত ত্রিপুরা রাজ্যে, একমাত্র রাজনৈতিক গণপ্রতিষ্ঠান জনমঙ্গল সমিতি। এর নেতৃত্বে ছিলেন পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, অমরেন্দ্র দেববর্মা এবং ঠাকুর প্রভাত চন্দ্র রায়। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সমিতি প্রায় দেড় বৎসর চলতে থাকে কিন্তু সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রভাত রায় ও সদর বিভাগীয় সম্পাদক অমরেন্দ্র দেববর্মার (বংশী ঠাকুর) অন্তরীণ অবস্থার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সমিতির ভাগ্য বিপর্যয়

শুরু হয়। প্রায় দুই বৎসর অন্তরীণ হওয়ার পর বিগত ২৬/৬/৫১ ত্রিং তারিখ কারামুক্ত হন। জনমঙ্গল সমিতিতে অংশগ্রহণকারী হিসাবে প্রয়াত নেতা বীরেন দত্ত, নিমাই দেববর্মা এবং আরও অনেকেও অন্তরীণ ছিলেন। দ্বিতীয়বার জেলে থাকাকালীন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে non collegiate student হিসাবে আইন পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এর মধ্যে জেল থেকে unconditional release হয়ে গেলেন। পরীক্ষার্থী হিসেবে university syndicateএর অনুমোদন পেয়েছিলেন। বাড়ী ফিরে দেখেন মায়ের জটিলতর অসুস্থতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালির রায় পুরা থেকে এম বি ডাক্তার কে সি নাথকে এনে মাকে চিকিৎসা করান। কিন্তু কোন ফল হয়নি। ২৭শে মাঘ ৫১ ত্রিপুরাব্দে মাতৃদেবী ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করেন। মায়ের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে নিমাই দেববর্মাকে চিঠিতে লিখলেন, "আজ কি মনে হয় জান? মনে হয় ক্ষুদ্র কারাগার হইতে যেন বৃহৎ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং কর্মব্যস্ততা এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে এমন একটি চীনের কারা প্রাচীর দাঁড়াইয়াছে যেখানে শুধু নির্বাক অথচ concious দর্শকের ন্যায় নিরপেক্ষতা বর্তমান।"

ঠাকুর প্রভাত চন্দ্র রায়ের কর্মপ্রণালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিনি যাই করতেন বা কোন কিছু যদি লিখতেন তার এক কপি ব্যক্তিগত খাতা বা ডায়েরীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখে রাখতেন। জেলে থাকাকালীন সকলের সাথে নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁর লেখা খাতা, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে জেইল তত্ত্বাবধায়কের সই সহ অনুমতিপত্র বিদ্যমান।

একদিন রাত্রে মুক্তির আগে তদানীন্তন মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুক্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। একান্তে প্রভাত রায়কে রাজবংশীয় হওয়া সত্ত্বেও মহারাজার বিরুদ্ধে কাজ করার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ স্কুলে পড়াশুনার জন্য সরকারী খরচে ঠাকুর বোর্ডিং-এ থেকে উমাকান্ত স্কুলে পড়াশুনা করেন ও পরে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারী খরচে পাঠরত ছিলেন। প্রভাত রায় অবশ্য বলেন, তার কাজকর্ম মহারাজার বিরুদ্ধে ছিল না এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হলেও মহারাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক যাতে সব দিক দিয়ে সুন্দর হয় এবং প্রজার স্বার্থে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তাই কারামুক্ত হওয়ার পর কুটির শিল্প বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং বেকার যুবকদের আয়ের পথ প্রসারের জন্য "পাহাড়ী বিড়ি" নামে বিড়ির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করিয়েছিলেন। এতে যাতে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো প্রত্যেকের ঘরে কুটির শিল্প হিসাবে প্রবর্তন হয়। এবং তাদের যাতে ব্যবসার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তিনি মনে করতেন যুদ্ধকালীন এই গুরুতর অর্থসংকটে এই কুটির শিল্প পক্ষাপক্ষ উভয়কেই আংশিক হলেও সাহায্য করবে। এরপর টাউন থেকে ১৮ মাইল দূরে "অভিজ্ঞতা লাভ ও ভবিষ্যতের ভরসা" এই উদ্দেশ্যে বংশী ঠাকুর সহ কন্ট্রাক্টরির কাজ ও করেছিলেন। এর মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করার খবর যে আসত না তা নয়। তারই পরামর্শে ছোট ভাই প্রবীর রায়ের পরিচালনায় এবং অন্যান্য যুবকদের যুগ্মদায়িত্বে "দি ত্রিপুরা মডার্ন হোটেল স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে।

জেলে অন্তরীণ কাল থেকেই ঠাকুর প্রভাত রায়ের দৈনন্দিন জীবনে ডায়েরী রাখাও একটি অভ্যাসে পরিণত করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল যাতে কোন সময়ে কোন কাজে অসুবিধায় না পড়েন। এরূপ কার্য্যের ফল একদিন তিনি হাতে হাতে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার সুনামগঞ্জ, সিলেট ইত্যাদি স্থানে পাথরকুচি, মোরাম ইত্যাদির সাপ্লায়ের কাজে আসা-যাওয়া ও টাকা পয়সা আদায়ের জন্য ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে হতো। একবার ঢাকা থেকে আগরতলা ফেরার দিন আখাউড়া-নারায়ণগঞ্জগামী এক ট্রেনে আট লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়। যেহেতু তিনি পুরাতন রাজবন্দী সন্দেহক্রমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রভাত রায়ের পক্ষে উচ্চ আদালতে সরকারী এডভোকেট প্রিয়নাথ ব্যানার্জী তথ্য প্রমাণ সহ যেভাবে সওয়াল করেন এবং ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস ভট্টাচার্য যেভাবে আসামী পক্ষে প্রমাণাদি হাজির করেন, মাননীয় উচ্চ আদালত আসামী প্রভাত রায়ের পক্ষেই নির্দোষ ও বেকসুর খালাসের আদেশ দেন। পরে অবশ্য উক্ত লুণ্ঠিত আট লক্ষ টাকা ও লুণ্ঠনকারীদের বৃটিশ ইন্ডিয়ার এলাকা থেকে উদ্ধার ও গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়।

একদিন মহারাজা প্রভাত রায়কে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আমি তোমাকে বিশেষ কাজ দিচ্ছি। আমার অফিস থেকে তোমাকে দেশ-বিদেশের ১০/১৫টি পত্রিকা প্রায়শই আমার লোক তোমার কাছে পৌঁছে দেবে। সঙ্গে দেবে লাল, নীল ও হলুদ রং-এর পেন্সিল। পত্রিকাগুলি মনযোগ সহকারে পড়ে পত্রিকার অংশ very important এবং নোটিশে নেওয়ার মতো সংবাদ দাগ দিয়ে দেবে। এবং আমার লোক গিয়ে দুইদিন পরপর পত্রিকাগুলি নিয়ে আসবে। আর আমি জানতে চাই তুমি মন্ত্রীত্ব বা কোন সরকারী উচ্চপদ চাও কিনা। চাইলে আমাকে জানাতে পার।" প্রভাত রায় তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। জানা গেছে, তাঁকে বিলেতেও পড়াশুনার জন্য বলা হয়েছিল। এইসব কিছু উপেক্ষা করে তিনি শুধু চেয়েছিলেন অশিক্ষিত অবহেলিত, নিপীড়িত ও নিদ্রাতুর সমাজের শিক্ষা, চেতনার বিকাশ ও আত্মনির্ভরশীল সচেতনতার পৌরোহিত্য করতে যাতে তারা আপন মহিমাতেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই বিলাস ব্যসনের পথ ছেড়ে ক্ষুরধার পথ বেছে নিয়েছিলেন। অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন। অথচ নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের সব উপকরণই তাঁর হাতের কাছে মজুত ছিল।

ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন পিতা স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় এবং নিষ্ঠাবতী মাতা স্বর্গীয়া হরসুন্দরী দেবীর তৃতীয় পুত্র প্রভাত রায় এর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা চেতনার গভীরতা মাতাপিতার আশীর্বাদেই সৃষ্ট। মায়ের স্নেহশাসন ও নিভৃত শিক্ষা ভাইদের এবং বোনের ভবিষ্যতের মনুষ্যত্ব লাভের পথে পরিচালিত করেছিল। তবে তিনি তাদের মধ্যে হতে পেরেছিলেন প্রথম সেনাপতি।

যাই হোক মহারাজার নিকট প্রজাস্বার্থে গঠনমূলক কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সমাজের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন।

"এইসব ম্লান মূঢ় মুখে দিতে হবে ভাষা, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"। এই ছিল আপাততঃ কর্ম

রূপায়ণ। দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রাইভেট কোচিং স্কুল স্থাপন করেন। নিজের বাড়ীর টালির ঘরে। ছাত্রছাত্রীদের বই খাতার ব্যবস্থা করা হয় বাড়ী বাড়ী থেকে সংগৃহীত সাপ্তাহিক মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে। পাড়ার গৃহকর্তারা এই শুভ উদ্যোগে অগ্রণী হয়ে সহযোগিতা করতে থাকেন। পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে তখন বেশ পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। এমনকি রাজ অন্তঃপুরের মহিলাদের মধ্যেও এর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল। ১৯৪১ সালে মাঝামাঝি মুক্তিপ্রাপ্ত প্রভাত রায় মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তায় কর্মী হিসাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এবং সমাজসেবিকা প্রয়াতা অনুরূপা মুখার্জী, শ্রীমতী হাসি রায়, পঙ্কজা দেবী, অলকা দেববর্মা, ভানুমতি নাথ এবং আরও মহিলাদের নিয়ে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপা মুখার্জী ছিলেন সেক্রেটারী এবং সুরবালা দেবী (প্রয়াত উস্তাদ বারীণ দেববর্মণের মাতা) ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৫২ সালে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আগরতলা কমিটির উদ্যোগে অভয়নগরে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন ও কুটির শিল্প গড়বার প্রয়োজনে "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য ও পরিবেশিত হয়েছিল। নারী সমিতি থেকে শিল্পীরা ছিলেন পঙ্কজা দেববর্মা, অনুরূপা মুখার্জী আরও অনেকে। এছাড়া শহরে আর্থিক সঙ্কটে সহায়তার জন্য ঘরে ঘরে ধান ছাঁটাই করে দরিদ্র পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিগত ২৮/১/৫১ ত্রিপুরাব্দে যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ রাজ্য আশঙ্কাজনক স্থান বলে পরিগণিত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য শ্রী শ্রী যুত মাণিক্য বাহাদুরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রক্ষী দল গঠিত হয়।

যেহেতু প্রভাত রায় সরকারী কাজে অনীহা প্রকাশ করেছেন নিজের আর্থিক সঙ্গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তখনকার ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্কে চাকুরী, প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতা, হোটেলের ব্যবসা করা, বাৎসরিক মেলায় দোকান দেওয়া, বাড়ীর সামনে মুদির দোকান চালান ইত্যাদি সবকাজেই পারদর্শী ছিলেন। এমনকি Modern Publicity Bureau-র কাজও অনেকদিন করেছিলেন। রাজ পরিবারভুক্ত হয়েও মন্ত্রিত্বের বা সরকারী উচ্চপদের লোভ করেননি। মানুষকে মানুষ হিসাবে বাঁচার লড়াইয়ে সামিল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন।

প্রয়াত বীরেন দত্ত, শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীঅঘোর দেববর্মা লিখিত বইয়ে প্রভাত রায়ের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। এছাড়া শ্রীকানু সেনগুপ্ত, শ্রীসরোজ চন্দ, শ্রীমতি লাল সরকার, শ্রী পারেন ঠাকুর, শ্রী বিমল চৌধুরী. শ্রী জীতেন পাল, শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রভাত রায় সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যক্ত করেছেন। জীবনের চলার পথে ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করে সাধারণ মানুষের কল্যাণের স্বার্থে তিনি আত্মবলিদান করেছেন।

আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন ভাইস চেয়ারম্যান প্রয়াত মণিময় দেববর্মা প্রয়াত রায়ের জীবনী রচনা প্রকাশের জন্য তাঁর লেখা কাগজপত্র ও 'চিনিহা' পত্রিকার কপি নিয়ে যান। কিন্তু

সময়ের বিবর্তনে মণিময় দেববর্মা কর্তৃক তাঁর জীবনী রচিত হয়নি। প্রভাত রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী হাসি রায়ের কাছ থেকে এ পর্যন্ত যতটুকু পাওয়া গেছে এর উপর ভিত্তি করেই প্রভাত রায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও তখনকার সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৪৬ সালে ঠাকুর প্রভাত চন্দ্র রায় কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মণের দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্র দেববর্মণের প্রথমা কন্যা হাসি দেবীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর প্রতি পদক্ষেপে স্ত্রীর সহযোগিতা পেয়েছেন। শ্রীমতী হাসি রায় ও স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীর সামাজিক, রাজনৈতিক গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন কি প্রভাত রায় আকস্মিকভাবে অন্তরীণ প্রাপ্ত হলে তাঁর অসমাপ্ত কোন কাজ করতে সমর্থ হয়েছেন। Tripura Modern Bank পরিচালিত Modern Publicity Bureauর বিভিন্ন advertising Agencyর কাজও রীতিমত চালিয়েছেন। বিভিন্ন পত্রিকা যেমন Financial Times, Assam Tribune, Jugantor, আনন্দবাজার রাখা, ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপনের খোঁজখবর নেওয়া, লেনদেনের হিসাব রাখা, সবই সঠিকভাবে চালিয়েছেন। তখনকার State Bank-এর বিজ্ঞাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেন। প্রভাত রায় তেজপুর জেলে থাকাকালীন নবজাগরণ, অভ্যুদয়, স্টেটসম্যান পত্রিকা পড়বার জন্য শ্রীমতী রায় সংগ্রহ করে আগরতলা থেকে পাঠাতেন। এইভাবে তৎকালীন সময়ে জীবনে চলার পথে সংগ্রাম করেছেন আরেক সংগ্রামী মহিলা শ্রীমতী সরযূ দত্ত — প্রয়াত বীরেন দত্তের স্ত্রী।

১৯৫৪ সালে প্রয়াত দ্বিজেন দে এবং প্রভাত রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঈশানচন্দ্রনগর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রয়াত প্রভাত রায় ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নাম মাত্র বেতনে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকে বিদ্যালয়টির কাজ চালিয়েছেন। তখনকার সময়ে রাস্তাঘাট, যানবাহনও উপযুক্ত ছিল না। সম্পূর্ণ অউপজাতি নিরক্ষর এলাকাতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আজও ঈশানচন্দ্র নগরের কিছু অধিবাসী প্রভাত রায়ের কথা মনে রেখে আগরতলায় তাঁর পরিবারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন।

প্রভাত রায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনের জন্য ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন মতবাদী দলের platform হিসাবে "প্রজামন্ডল" প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন ঠাকুর যোগেশ চন্দ্র দেববর্মণ। পরিচালনায় ছিলেন বীরেন দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বংশীঠাকুর, কানু সেনগুপ্ত, গোপেশ্বর দেববর্মা, বীরচন্দ্র দেববর্মা, বাদশা মিঞা প্রমুখ। প্রজামন্ডল সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন "জাতীয় মনোভাব গড়িয়া তুলিতে প্রজা-অপ্রজা কথার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে। দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র পাইলে প্রজারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কে শোষক তাহা চিনিয়াই সংগ্রাম করিতে পারিবে। আমলাতন্ত্রকে আঘাত করাই হইল অপ্রজাকে আঘাত করা। আমলাতন্ত্র কাতর হইয়া পড়িলে প্রজাশক্তিই জয়ী হইবে।

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রাদেশিকতা উগ্র হইল কেন? কারণ Bourgeois democratic revolution সম্পূর্ণ হয় নাই। Feudalism জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। জোর করিয়া কোন প্রদেশের

অন্তর্ভুক্ত করা বা কোন ছোট রাজ্যের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপাইয়া স্থূল সমস্যার সমাধান হইবে না।

তাই ত্রিপুরা রাজ্যবাসী প্রজাকে "বসুধৈব কুটুম্বকম" উপদেশ দেওয়ায় কোন কাজ লাগিবে না। তাহাতে শোষণই বৃদ্ধি পাইবে, শোষণকে অব্যাহত চলার কথাই বলা হইবে।

অপরপক্ষে অপ্রজার বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

ইহাই সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা। প্রজা-অপ্রজা কথার মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয়ভাব অঙ্গাঙ্গী অবস্থায় লাভ কিভাবে করিয়াছে তাহা না বুঝিলে এভাবেই ভুল করিতে হইবে।

আমরা দেখেছি পাকিস্তানী হামলার আশঙ্কাকালে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও পার্বত্য প্রজার জাতীয়তাবাদী। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়ভাব ও অর্থনৈতিক চেতনা কিভাবে ওৎপ্রোত মিশে আছে তা R. Palme Datta বলেছেন —

"The basic problem of India is not only national but social. The challange of the Indian people to imperialism is in its simplest sense a claim of one-fifth of humanity to freedom from foreign domination. But this demand for freedom inevitably strikes deeper than a claim for political independence in which it finds its political expression. It is not a challange to a deeply entrenched system of exploitation which is closely bound up with a subordinate system of privilege and exploitation within India. The one cannot be touched without the other.

In this sense the Indian question is in the last analysis a social question."

প্রভাত রায় স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সংরক্ষণশীল প্রথা ত্যাগ করে সকলকে সমাজ উন্নয়নমূলক কার্য্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে প্রত্যেক মিটিং মিছিলে নিয়ে যেতেন। যেসব মহিলা তাঁর প্রেরণায় এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনুরূপা মুখার্জী অন্যতম। ১৯৫৫ সালে মহিলাদের স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে দশ তাঁত বিশিষ্ট সমবায় নারী শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের বাড়ীতে। কিছু দুঃস্থ আগত শরণার্থী পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দৈনিক গাওয়াল ব্যবসার জিনিষপত্র প্রদান, ছোট বিড়ির কারখানার জিনিষপত্র সরবরাহ করেন। যুবকেরা শ্রমবিমুখ না হয়ে ছোট বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, অলসতা ত্যাগ করে কর্মঠ হোক এই ছিল তাঁর আশা। আজও উপকৃত লোকেরা প্রভাত রায়কে স্মরণ করেন।

তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান ১৯৪৯ একক প্রচেষ্টায় 'চিনিহা' পত্রিকার সম্পাদনা। নিজেই নিজের পত্রিকার সরবরাহ করেছেন। ১৯৪৮ সালে ২৬শে জুন "প্রজামন্ডল' আন্দোলনের ফলে নিরাপত্তা আইনে প্রভাত রায় বংশী ঠাকুর, বীরেন দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত সহ আরও কর্মীরা গ্রেপ্তার হন। প্রভাত রায় ও বীরেন দত্ত দেড় মাসের মধ্যে আগরতলা সদর জেল থেকে বিগত ১৬ই শ্রাবণ ১৩৫৮ ত্রিং এ সোমবার তেজপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। তেজপুর জেল থেকে প্রভাত রায় মুক্তি পান ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ এ। ১৯৪৯ সালে 'চিনিহার' সম্পাদনার কাজে হাত দেন।

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে এই কাগজ এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল।

"চিনিহা" থেকে উদ্ধৃত তথ্য

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছে তাদের পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি, 'চিনিহা পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত প্রভাত রায় ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ কমিশনারকে জ্ঞাপন করার জন্য সম্পাদকীয়তে লেখেন ও পরে চীফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের আশ্বাস আদায় করেন। পত্রিকার তারিখ ৬ই আষাঢ় বুধবার ১৩৬০ ত্রিং (১৯৫০) পত্রিকার মূল্য ৪ (চার) পয়সা। ২য় বর্ষ (১২০০) সংখ্যা। ইহার পরের এক সংখ্যা ২৭শে আষাঢ় বুধবার ১৩৬০ ত্রিং এ প্রকাশ 'চিনিহা' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এন এম টি এসের (NMTS) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করায়। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় ত্রিপুরার ইতিহাসে স্থানীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক মামলা ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম।

পক্ষান্তরে মামলার পথ গ্রহণ করা সত্ত্বেও পরে এন এম টি এস-এর ম্যানেজার সহযোগিতা আহ্বান করায় সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমাদের অবলম্বিত নীতির যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। বিচারে পত্রিকার পক্ষেই তদানীন্তন মাননীয় বিচারক রায় দেন। "যদি ঘটনার গতি আমাদের অনুকূল নাও হইত, তথাপি উহাকে আমরা জনসেবার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই গ্রহণ করিতাম। মাননীয় বিচারপতি তাঁহার রায়ে আরও বলেছেন যে, সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ ও ন্যায্য সমালোচনার অধিকার আছে। তাঁহার জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় 'চিনিহার' সাফল্যকে আমরা স্থানীয় সমস্ত পত্রিকার সাফল্য তথা ত্রিপুরার জনগণের জয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।"

জনকল্যাণ পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে সংবাদপত্রের মর্যাদা যথাযথ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হওয়ায় সহযোগী চিনিহা সম্পাদককে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। চিনিহার জয় সমস্ত সাংবাদিকের জয় তথা জনমতের জয় এবং এই প্রথম সংবাদপত্রের জয়।"

বিগত ১৬ই জুলাই রবিবার ১৯৫১ ইং ত্রিপুরা চীফ কমিশনার শ্রীযুক্ত আর কে রায়ের নিকট চীফ চিনিহা" পত্রিকার স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চাইলে, তিনি বলেন, "মত বিরোধের অবকাশ সত্ত্বেও আগরতলার মধ্যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দিক দিয়া ইহার উচ্চ স্থান অনস্বীকার্য্য।"

তাঁর পত্রিকার ত্রিপুরায় আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ত্রিপুরা সরকারের নিকট আবেদন রাখা হয়। প্রয়োজনবোধে চীফ কমিশনার মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়গুলি নিবেদন করতেন। দ্বিতীয় চীফ কমিশনার কে কে হাজারি প্রভাত রায়ের লেখা পড়ে এবং পরে সাক্ষাতে উনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এই কম বয়সে এত পরিণত, লেখা!

পূর্বতন ত্রিপুরার এডভাইজারী শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে তদানীন্তন চীফ কমিশনার ভি এস নামজাপ্পা তিন এডভাইজার নিয়োগে [illegible] এক এডভাইজার হিসাবে মক্ত রাজবন্দী প্রভাত রায়কে নিয়োগের
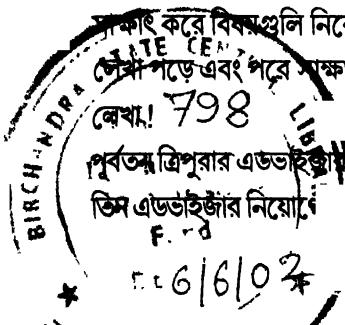
প্রশ্নে অভিমত জানতে চাইলে প্রভাত রায় চীফ কমিশনারকে বলেন, যে আগরতলা সেন্ট্রাল জেল থেকে প্রথম মুক্তির আগে ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর তাঁকে ত্রিপুরার মন্ত্রিত্ব বা কোন সরকারী পদ গ্রহণ করতে রাজী আছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি কোনটাই গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বর্তমানে এডভাইজার পদও গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এই বিষয়টি এডভাইজার প্রয়াত জীতেন্দ্র মোহন দেববর্মার কাছে থেকে শোনা যায়।

১৯৫০ ইং সনের আষাঢ় মাসের 'চিনিহা' পত্রিকায় দেখা যায়, উদ্বাস্তু আগমনের পর লেখা হয়েছিল এই রাজ্য ত্রিপুরা হিন্দু-মুসলমান, উপজাতি সকলের। সহস্র বছরের ইতিহাস আমাদের পিছনে। সহস্র বছর ধরিয়া হিন্দু, মুসলমান, উপজাতিগণ, তাহাদের এই জন্মভূমির নীড়ে শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। চারিদিকে যখন অশান্তির আগুন দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে, ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলমান তখনও আলোড়িত হয় নাই।

"মাটির মায়া উন্মাদনা কখনও মাটির বন্ধনকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়াই আগাইয়া গিয়াছে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, সে ইতিহাস বাঙালীর কাছে অপরিচিত নয়।")ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ত্রিপুরায় আগমনের প্রাক্কালে লিখিত)। তিনি আরও লিখিয়াছেন "ত্রিপুরার মুসলমানগণ ও এই ত্রিপুরার বণ বনজঙ্গল কাটিয়া ত্রিপুরার বুকে সোনা ফলাইয়া আসিয়াছে। কৃষি উৎপাদনে তাহাদের স্থান আজ বিশিষ্ট জায়গায়। ত্রিপুরার নিজস্ব কৃষ্টি গড়িয়া তুলিতে মুসলমানদের অবদান কম নয়। ত্রিপুরার সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে বলিতে চাই তাহারা যেন এরূপ কোন ভ্রান্ত ধারণায় প্রলুব্ধ না হন। সুস্থ ও প্রগতিমূলক সমাজ রচনার পথে জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখিতে আমরা রিফিউজি ও স্থায়ী নাগরিক বৃন্দকে আজ ধীর স্থির ভাবে সম্ভাব্য ভাষণের মর্মমূল উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।"

১৯৫১ সালে গণতান্ত্রিক সংঘের পক্ষে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে প্রভাত রায় কমিশনার পদে কৃষ্ণনগর এলাকায় জয়ী হন। ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনের জন্য সর্বদলীয় মঞ্চ। ইহা দলমত নির্বিশেষে দায়িত্বশীল শাসন লাভের তাগিদে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং বিশিষ্ট নির্দল ব্যক্তিবর্গ এতে যোগ দেন।

প্রভাত রায়ের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে। তাঁর লেখা কবিতা, প্রবন্ধগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আদর্শের প্রেরণা জোগায়। তিনি যখন ছাত্রজীবনে প্রথম বৃটিশ আন্দোলনে অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দী হন তখন কতই বা বয়েস ১৬ বা ১৭ বছর। তিনি লিখেছেন "স্বপ্ন চালিতের মতো কবিতা লিখে যাই। কোথা থেকে প্রেরণা আসে জানি না।" আবার লিখেছেন "দ্বিতীয়বার কারাগমনে রাহুরূপী রাজনৈতিক চিন্তা ও কল্পনা সেগুলিকে গ্রাস করিয়াছে তবে আমার লেখাগুলির প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাই নাই।"

মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা চাওয়াই তাঁর আসল পরিচয়। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষের গণতান্ত্রিক ও মানবীয় অধিকার ব্যক্তি ও সমাজ বিকাশের অপরিহার্য্য পূর্ব

শর্ত।

সত্যিই এমন এক মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী প্রতিবাদী মানুষের জীবন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে পারে না। তাই এই আকালের দিনেও যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, বিশ্বমানব পরিবারের প্রত্যেকেরই রয়েছে অন্তর্নিহিত মর্যাদা আর সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার, প্রতিটি মানুষের রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার অত্যাচারিত না হওয়ার অধিকার, তাঁদের রক্তে তিনি আজও দোলা দিয়ে যাবেন।

মনে রেখো তোমার পশ্চাতে
আমি আসিতেছি
নহে বহুদূর
আসার সময়।
পুরাতন হয়ে গেছি
জগতের মাঝে
নবদূত এল বলে
বিহঙ্গ ধরেছে তান আগমনী তালে
স্বাগতম গীতি।
মনে রেখো আমার আকুতি।
(৩০/১২/৪৪।)

ব্রজবিহারী রায়

নক্ষত্র রায়* (ছত্রমাণিক্য)-এর বংশলতিকা
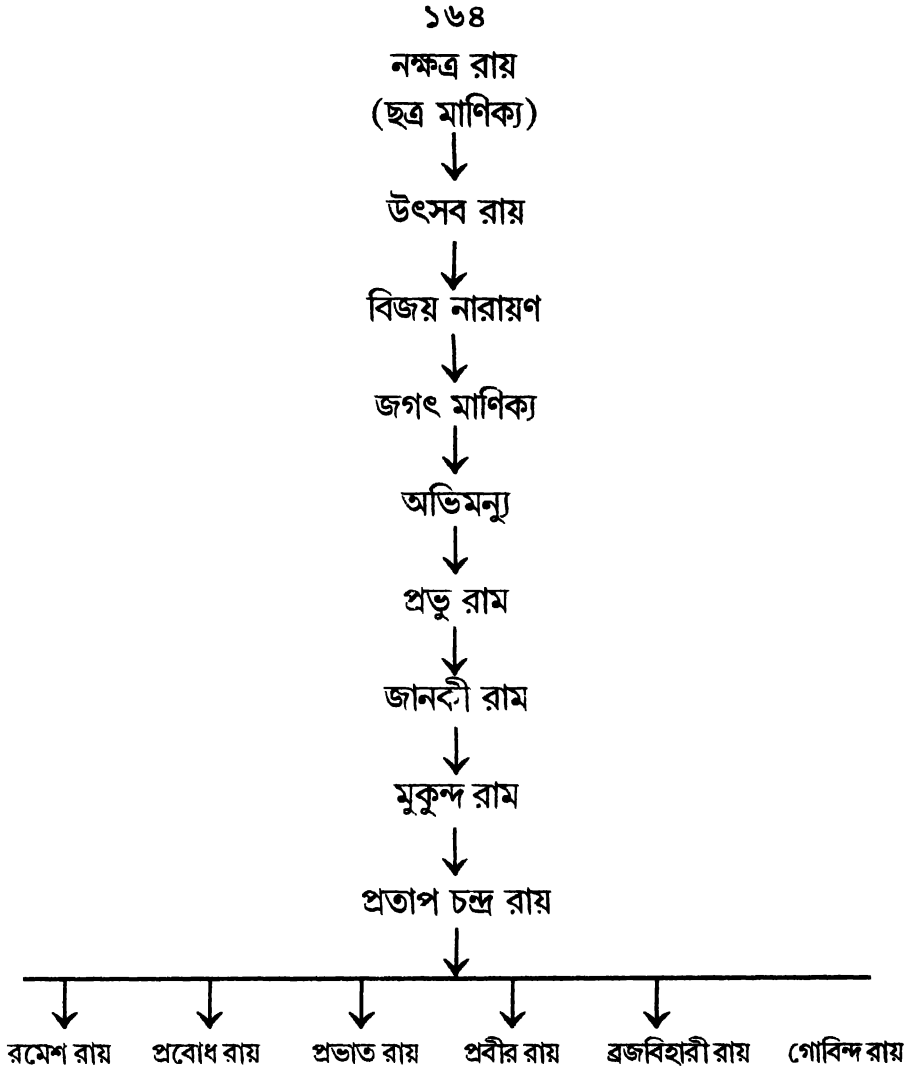
*ত্রিপুরার রাজা নক্ষত্র রায় ছিলেন প্রভাত চন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ। নক্ষত্র রায় ছিলেন মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোবিন্দ মাণিক্য ও নক্ষত্র রায়ের কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'বিসর্জন' ও উপন্যাস 'রাজর্ষি' রচনা করেন।

প্রভাত রায়ের জীবনপঞ্জি

১) জন্ম — ২৬ মার্চ ১৯১৪

২) শৈশবে ঠাকুর বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা।

৩) ১৯৩০ সাল ঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার ও স্বর্ণপদক লাভ। এরপর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াশুনা।

৪) ১৯৩১ সাল ঃ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে প্রথমে কুমিল্লা জেলে, পরে আগরতলা সদর জেলে বন্দী।

৫) ১৯৩৬ সাল ঃ সদর জেল থেকে ডিস্টিংশনে বি. এ পাশ।

৬) ১৯৩৭-৩৮ সালে মুক্তি এবং 'জনমঙ্গল' সমিতি গঠন। এর আগে 'সবুজ সমিতি' গঠন। (১৩ই ভাদ্র ১৩৪৮ ত্রিং) এর দেড় বছর পর অন্যান্য কর্মীগণ সহ্ কারাবরণ। নেতৃত্বে ছিলেন পঃ গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, অমরেন্দ্র দেববর্মা ও প্রভাত রায়।

৭) ১৯৪১ এর সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভ।

৮) ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারী ঃ মায়ের মৃত্যু ।

৯) ১৯৪২ ঃ বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ।

১০) ১৯৪৬ ঃ 'প্রজামন্ডল' সমিতি গঠন। (সভাপতি ঠাকুর যোগেশ চন্দ্র দেববর্মণ, অন্যতম সদস্য - বীরেন দত্ত, প্রভাত রায়, কানু সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

১১) ১৯৪৮, ২৬শে জুন ঃ নিরাপত্তা আইনে জেলে আটক।

১২) ১৯৪৮ (১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৮) তেজপুর জেলে স্থানান্তর ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ ঃ মুক্তি লাভ।

১৩) ১৯৪৯ ঃ 'চিনিহা' সম্পাদনা ও প্রকাশনা।

১৪) ১৯৫১ ঃ পৌর সভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সংঘের পক্ষে কমিশনার পদে জয়লাভ।

১৫) ১৯৫১ ঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক সংঘ প্রতিষ্ঠা। (সভাপতি আইনজীবী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক জীতেন পাল, অন্যতম উদ্যোক্তা - প্রভাত রায়, বীরেন দত্ত ও অমরেন্দ্র দেববর্মা ও বীরচন্দ্র দেববর্মা।

১৬) ১৯৫৪ ঃ প্রয়াত দ্বিজেন দে সহ্ ঈশানচন্দ্রনগর স্কুল প্রতিষ্ঠা। উক্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা দান।

১৭) ১৯৫৫ ঃ প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি ও আদিবাসী সংসদে যোগদান। এবং আদিবাসী প্রতিনিধি হিসাবে শিলং এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী পঃ নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৮) ১৯৫৬ সাল ঃ কংগ্রেসে যোগদান এবং শান্তিরবাজার এক সভায় যোগদানের জন্য সাব্রুমে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু।
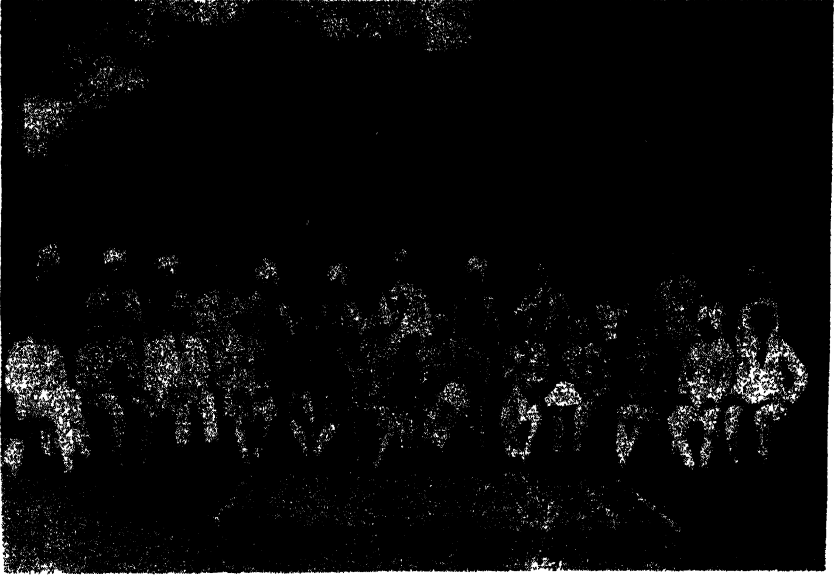
মহারাজ বীরবিক্রমের রাজ্যাভিষেকের গ্রুপ ছবি। পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় বাঁদিক থেকে প্রভাত রায়ের পিতা প্রতাপ চন্দ্র রায়। ছবি ঃ পারিবারিক।

সস্ত্রীক প্রভাত রায়। ছবি ঃ পারিবারিক
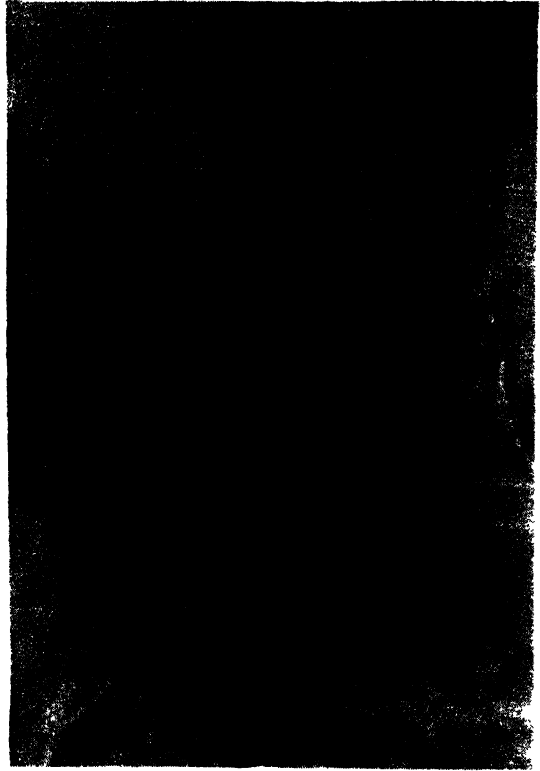
প্রভাত রায়ের পিতা প্রতাপ চন্দ্র রায়।

ক্যাপ্টেন প্রবোধ চন্দ্র রায়। প্রভাত রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

প্রভাত রায়।

প্রবীর রায়।

ব্রজবিহারী রায়।
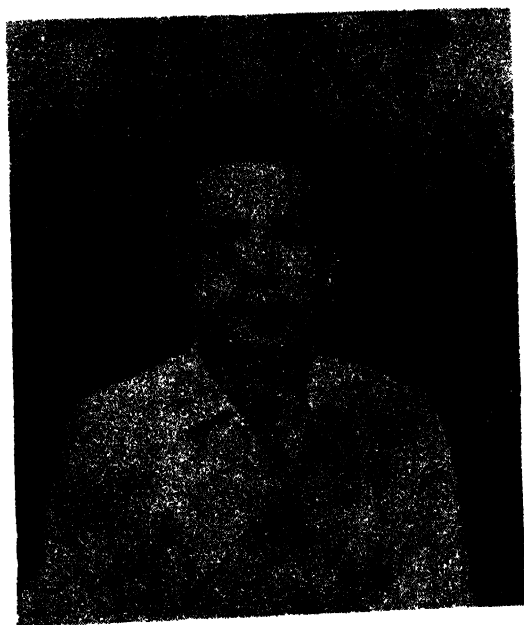
গোবিন্দ রায়।

একমাত্র ভগ্নী কল্যাণী রায়।

ভ্রাতুষ্পুত্র মৃগাঙ্ক রায়।

This is to certify that

Prabhatchandra Ray

obtained the Degree of Bachelor of Arts
in this University with Distinction
at the Annual Examination in the
year 1936.

Vice-Chancellor.

Dated the 17th January 1937.

অধ্যায় ২

ত্রিপুরার সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রভাত রায়ের চিন্তাচেতনা ও অবদান

ত্রিপুরার আবহমান ইতিহাসের আলোকে বিংশশতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশক বাস্তবিক অর্থেই এক যুগ সন্ধিক্ষণ। একদিকে শত-সহস্র বৎসরব্যাপী চলে আসা রাজন্য শাসনের অবসানের অন্তিম মুহূর্ত অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে উত্তরণের এই মুহূর্ত প্রকৃত অর্থেই ত্রিপুরা রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়।

ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার ফলশ্রুতিতে এ দেশ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের চিরতরে অবসানের শেষ ঘন্টাধ্বনি প্রত্যন্ত ত্রিপুরাতেও অল্পবিস্তর অনুভূত হয়েছিল। তারই অংশ বিশেষ হিসেবে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় ও বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। রাজ্যে সামন্ত শাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের অমোঘ লক্ষ্যে তাই ১৯৬৫ সালে গঠিত হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ। গণপরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ ও তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দ। এরপর ত্রিপুরার প্রজা সাধারণের আর্থ-সামাজিক সমস্যা থেকে উত্তরণ বিশেষতঃ ঘবচুক্তি খাজনা বাতিল, রাস্তাঘাট-স্কুল-হাসপাতাল পরিষেবা উন্নয়নের জন্য সামন্ত শাসন ব্যবস্থাব সংস্কার সাধনের মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী দায়িত্বশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে কিছুসংখ্যক শিক্ষিত জাতি-উপজাতি ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয় ত্রিপুরা জনমঙ্গল সমিতি সেই ১৯৩৮ সালে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিব্যাপ্তির ভয়ঙ্কর মুহূর্তে গণআন্দোলন সম্পর্কিত কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হয়ে যায়। তথাপি এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের ভেতরেই রতনমণি রিয়াং (ত্রিপুরার) সুযোগ্য নেতৃত্বে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে দেখা দেয় প্রজা বিদ্রোহ। দুর্নীতি পরায়ণ স্বৈরাচারী রাজ আমলাকুলের দ্বারা নীরিহ জনসাধারণের উপর জোরজুলুম ও অত্যাচার এর প্রতিবাদেই এই বিদ্রোহ। ১৯৪৩ সালের রিয়াং বিদ্রোহ ত্রিপুরার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অনুচ্ছেদ।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় সাধারণ শিক্ষা পরিকাঠামোর দুর্বলতা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রাজধানী আগরতলা এবং সীমিত সংখ্যক মহকুমা শহরে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও গ্রাম ত্রিপুরা বিশেষতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত সমগ্র পার্বত্য ত্রিপুরায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। অশিক্ষার এই অন্ধকার থেকে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবং সামগ্রিক সমাজ সচেতনতার লক্ষ্যে কতিপয় শিক্ষিত আদিবাসী যুবকদের দ্বারা গঠিত হয় জনশিক্ষা সমিতি — ১৯৪৫ সালে। অনন্য সাধারণ সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ার দক্ষতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে জনশিক্ষা সমিতির ত্রিপুরার শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সফল সূচনা অনস্বীকার্য।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এইভাবে ধীরে ধীরে একটির পর একটি গণ সংগঠন গড়ে উঠা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে প্রবল জনমত সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ। মহারাজ বীরবিক্রম এটা ভালো ভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন। সেই জন্যে এই সমস্ত গণমুখী সংগঠনগুলোকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে রাজানুকূল্যে গঠিত হয় ত্রিপুর সঙ্ঘ।

মহারাজ বীরবিক্রমের ঘনিষ্ঠ মহল বিশেষভাবে ব্রজলাল কিশোর দেববর্মণ, দুর্জ্জয় কিশোর দেববর্মণ, জীতেন্দ্রমোহন দেববর্মণ ও অন্যান্য রাজ কর্মচারীদের উপর ত্রিপুর সঙ্ঘের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ত্রিপুর সংঘ এবং এবং জনশিক্ষা সমিতির মধ্যে বিভিন্ন সংঘাতে জনশিক্ষা সমিতিই অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়।

ত্রিপুরাব রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৬ ইং এক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। সেই ১৯৪৬ সালেই ত্রিপুরায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। একই সময়ে গঠিত হয় ফরোওয়ার্ড ব্লক এবং ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল। ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল নিঃসন্দেহে ত্রিপুরায় সামন্ত শাসনের সংস্কারের মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণের লক্ষ্যে নিবেদিত একটি গণ সংগঠন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক মুহূর্তে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভাবধারা অবলম্বনে অখন্ড ভারত বিভাজন এবং সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলীম অধ্যুষিত প্রাদেশিক অঞ্চল সমূহকে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জোর প্রক্রিয়ায় স্বাধীন ত্রিপুরার ভাগ্য নির্ণয়ে অর্থাৎ ত্রিপুরা কি ভারতে অন্তর্ভুক্তি হবে না পাকিস্তানে এই বিতর্কের মুহূর্তে সম্প্রদাযভিত্তিক দুটি গণসংগঠন ত্রিপুবায় গড়ে উঠে। একটি অঞ্জুমান ইসলামিয়া— আবদুল বারিক যিনি গেদু মিঞা নামেই সর্বাদিক পরিচিত — তাঁর নেতৃত্বে। বিপবীত পক্ষে গড়ে উঠে ত্রিপুরা বেঙ্গলী হিন্দু সম্মিলনী।

ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রমের জীবদ্দশায় দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা ভারতেই অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কিছু অনুকূল পবিবেশ বচিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে মহাবাজ বীরবিক্রমের মৃত্যু — নাবালক মহারাজ কীরিট বিক্রম কিশোরের পক্ষে রাজ্য চালনায় মহাবাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর রিজেন্সী গ্রহণ এবং ভারত সরকারের বিশেষতঃ জওহরলাল নেহরু ও তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভবাঈ প্যাটেলের সক্রিয় সহায়তায ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। বিজেন্সী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং ভারত সরকারের পক্ষে বল্লভবাঈ প্যাটেলের মদ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ১৯৪৯ সালে প্রথমার্ধে। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে।

এখানে উল্লেখ প্রযোজন, অঞ্জুমান ইসলামিয়া বিশেষভাবে আবদুল বারিক ওরফে গেদু মিঞা এবং মহারাজ কুমার দুর্জ্জয় কিশোর দেববর্মণ যুক্তভাবে ত্রিপুরাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ তৎপরতা চালিয়েছিলেন। পাকিস্তানপন্থী এই তৎপরতাই ত্রিপুবাকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করে। মহারাজ কুমার দুর্জ্জয়কিশোর ত্রিপুর সঙ্ঘের পাল্টা সংগঠন হিসেবে বীরবিক্রম ত্রিপুর সঙ্ঘ এবং এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে সেংক্রাক গঠন করেছিলেন।

১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির জন্ম এবং গ্রাম পাহাড়ে এর দ্রুত জনপ্রিয়তা ও কর্মপরিধি বিস্তারে শুধু কয়েকশত প্রাথমিক স্কুলই প্রতিষ্ঠা হয়নি। সাথে সাথে আদিবাসী সমাজ জীবনে কুসংস্কার-

অর্থনৈতিক পরাধীনতা তথা মহাজনের শোষণ ইত্যাদি থেকে মুক্তির গণচেতনাও যুগপৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল।

জনশিক্ষা সমিতির গণচেতনা জাগরণ এবং গণআন্দোলনকে আরও বাস্তবমুখী রূপদানের প্রয়োজনে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের মে মাসে। মুক্তি পরিষদের জঙ্গী আন্দোলনের ও সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রথম রাজধানী আগরতলায় প্রদর্শিত হয় ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট। এক মহামিছিলের মাধ্যমে।

ক্রমবর্ধমান সংগঠন শক্তি বৃদ্ধি ও সারা ত্রিপুরায় তার প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ সংগঠিত হয় ঃ ৯ই অক্টোবর ১৯৪৮ সালে (২৩শে আশ্বিন ১৩৫৫ বাং)। এই বিদ্রোহ গোলাঘাটির কৃষক হত্যার ঘটনা হিসেবেই ত্রিপুরার গণআন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাধিক পরিচিত। গোলাঘাটির গুলী চালনার ঘটনায় মোট ৭ জন কৃষক নিহত এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনা সারা ত্রিপুরায় দাবানল সৃষ্টি করেছিল। মুক্তি পরিষদ পুলিশ মিলিটারীর বন্দুকের মোকাবিলার জন্যে সদর-খোয়াই-কমলপুরে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪৮ সালের গোলাঘাটির গুলী চালনার ঘটনায় ত্রিপুরায় পার্বত্য অঞ্চলে অগ্নিগর্ভ অবস্থায় ঘৃতাহূতির মতো কাজ করে ঠিক ৪ মাস পর ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে (১৪ই চৈত্র ১৩৫৬ বাং) পদ্মবিলে মিলিটারীর বর্বরোচিত গুলী চালনায় ৩ জন আদিবাসী রমনী (কুমারী-মধুতি-রূপশ্রী) নিহত হন। পদ্মবিলের এই নৃশংস ঘটনা সারা রাজ্যব্যাপী মুক্তি পরিষদ আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। ত্রিপুরা প্রশাসন মুক্তি পরিষদকে দমন করার জন্যে প্রথমে সারা খোয়াই মহকুমায় সামরিক শাসন বলবৎ করেন ৯ই মে ১৯৪৯ ইং সনে। সামরিক শাসনের মাধ্যমে নির্বিচারে একের পর এক আদিবাসী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, লুঠপাট, নারী ধর্ষণ, নীরিহ গ্রামবাসীদের উপর অমানুসিক দৈহিক নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে। মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী (যাদের প্রায় সবাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন সৈনিক) ও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পুলিশ মিলিটারীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ত্রিপুরা প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ভারতের উত্তর-পূর্বের ছোট্ট পার্বতী ত্রিপুরায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এই জঙ্গী আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে। কিন্তু সেই আন্দোলন কার্যতঃ স্থানীয় কিছু নেতৃত্বের পরিচালনায় ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পবিষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ত্রিপুরার এই জনজাগরণকে সুসংহত রূপদান এবং আরো গণমুখী করার লক্ষ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেশ কিছু নেতৃত্বকে সংগোপনে ত্রিপুরায় এসে গণআন্দোলনে সামিল ও নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পরামর্শ দেন।

তাই ১৯৫০ সাল থেকে ৫২ সালে একে একে অত্যন্ত সংগোপনে ত্রিপুরায় এসে পৌঁছান — নৃপেন চক্রবর্তী, ডাঃ বিজয় বসু, মোহন চৌধুরী, রঞ্জন রায়দের মতো ঝানু কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই পরিচিতি ছিল ছদ্মনামে। পরবর্তী কালে তাঁদের প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্মনামেই বেশী পরিচিত লাভ করেন। সুদক্ষ ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নৃপেন চক্রবর্তীর পরামর্শে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের নাম সামান্য পরিবর্তন করে রাখা হয় ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি

পরিষদ। এই 'সামান্য' নাম পরিবর্তনের গভীর ও অসামান্য তাৎপর্য হলো মূলতঃ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এই সুসংহত জঙ্গী আন্দোলনকে পাহাড় কন্দরে সীমিত না রেখে ত্রিপুরার সমতলে অ-আদিবাসী জনসমষ্টি বিশেষভাবে বিপুল উদ্বাস্তু জনগণকে ও একই ছত্রছায়ায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরার বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য কমিউনিস্ট পার্টির এই সুদুরপ্রসারী নীতি পরবর্তী সময়ে বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে এবং ভূ-ভারতে ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্যপ্রাপ্ত একটি রাজ্য হিসেবে সুপরিচিত লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গণমুক্তি পরিষদ ১৯৬৭ সালে আবার উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে — ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই।

ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের এই দুর্বার গণআন্দোলনর পাশাপাশি সমতলে বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে আরো কিছু গণসংগঠন গড়ে উঠে। শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে গণপরিষদ, বীরচন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘ এবং সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে আদিবাসী সংসদ।

ত্রিপুরার ভারতের অন্তর্ভুক্তি ভারতের সংবিধান প্রণয়ন এবং কার্যকর করার ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা 'গ' শ্রেণী প্রশাসনিক মর্যাদা লাভ করে। ৩০টি আসন বিশিষ্ট ইলেকটোরেল কলেজ এবং লোকসভার ২টি আসন ও রাজ্যসভার একটি আসন ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫২ সালে লোকসভার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুক্তি পরিষদ স্ব-নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কমিউনিস্ট পার্টির নামে। প্রথম লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে হঠাৎ গঠিত হয় গণতান্ত্রিক সংঘ। যার নেতৃত্বে ছিলেন বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। উল্লেখ করা প্রয়োজন — ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে চমকপ্রদভাবে জয়লাভ করেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে দশরথ দেব এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বীরেন দত্ত এবং সর্বতোভাবেই ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ তথা ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের সুসংগঠিত প্রবল জনশক্তিকে ব্যবহার করে।

বিগত বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আলোচনায় বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বদের উল্লেখ এসেছে বারে বারে। কিন্তু সমসাময়িক ত্রিপুরার এই রাজনৈতিক আবর্তে অন্য একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাদপ্রদীপের বাইরে থেকে গেছেন। অথচ যার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা এবং উল্লেখিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যাঁর সময়োপোযোগী এবং সুদূরপ্রসারী উপদেশ ও নীতি নির্দেশিকাকে পাথেয় করে পরবর্তীকালে শক্তিশালী গণসংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি যেন কাব্যে উপেক্ষিত। ত্রিপুরার গণ আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়েও যিনি রয়ে গেলেন ইতিহাসের বিস্মৃতির অধ্যায়ে। তিনি আর কেউ নন স্বর্গত প্রভাত রায়। নক্ষত্র রায়ের বংশলতিকার সুযোগ্য উত্তরপুরুষ। সুশিক্ষিত, সংবেদনশীল এবং সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যার উপস্থিতি এবং সুদৃঢ় নেতৃত্বের ভূমিকা অনুল্লেখে ত্রিপুরার সমসাময়িক ইতিহাস হয়তঃ অপূর্ণই থেকে যাবে। প্রভাত রায়ের বহুমুখী প্রতিভা এবং তাঁর অবদান বর্তমান এবং ভাবী ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে

তুলে ধরার বিনম্র প্রচেষ্টায় আমরা স্বর্গত রায়ের অনুপুঙ্খ না হোক যতটুকু সম্ভব সমস্ত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্যাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করার প্রয়াস নিয়েছি। স্বর্গত রায়ের লিখিত প্রবন্ধাবলী-চিঠিপত্র এবং নিজস্ব জীবনপঞ্জির নির্বাচিত অংশ পাঠে ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণ ত্রিপুরা রাজ্য ও রাজ্যের মানুষের জন্য তিনি কি অবদান রেখে গেছেন তার মূল্যায়নে সহায়ক হলেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সার্থকতা।

নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

WHITHER MISTAKES

A Significant Day

26.04.48 T.E. is both a memorable and a tragic day; memorable in regard to the annals of Tripura State, tragic in relation to the history of our lives. It was this day which carried for the first time the announcement of His Highness purporting the happy inauguration of a new reform best sailed to the times, place and circumstances. The day happened to be a tragic factor in so far as it related to the political side of our lives, to our connection with Janamangal Samity. The first political organisation in the State, to the priceless facilities opened up before us for the attainment of our objectives and to our contemptible in ability to reap the benefit from the potential advantages, perhaps near to come again.

JANAMANGAL SAMITY

This declaration foreshadowing the introduction of a reform was acclaimed with enthusiasm particularly those who are interested with the political development of the State and pinned their hope and faith on the ruler as the priest of progress and reform. The news spread like wildfire in all directions to kindle high hopes and unbounded delight among all sections of people probably expecting those who consciously or unconsciously, are in ever anxiety of their interests and can not but look with disfavour, any idea of changes lest their source of income should be affected. The latters are staunch believers of status quo and owing to the very nature of their outlook. They are disagreeable even to a nominal move from the existing state of affairs. And rightly or wrongly, according to the personal acquaintance of the writer with the majority of the people, the idea gained strong ground in almost all sections of the people that there has been none in this place who think for the good of the state in term of the good of its people and if there be any one for them it is the ruler himself standing alone. The writer remembers well the depth of their love for the present ruler and the extent of their panic when for sometime news was received in course of His Highness's perilous sojourn in European Countries. This side of the popular feeling coupled with the livelihood of an earlier inauguration of reforms as has been envisaged by the ruler himself, led to the birth of Janamangal Samity on the 13th Bhadra, 1348 T.E. in the Sree Durgamandap before a large gathering, which was marked by the attendance of some distinguished officers of the State like the present

Commissioner of Police, the late Renu Saheb, the present Chief Justice Bahadur, Mr. Satya Ranjan Bose and others. Other prominent members of the public like Babu Priyanath Banerjee, Babu Ramanath Chakraborty, Babu Braja Gopal Banerjee (in the Chair), Babu Abdul Ajij Munsi and others were present. The meeting recorded for its aim, the attainment of responsible government under the aegis of the king in all legitimate ways starting on the basis of the reform foreshadowed in the edict of 26.04.48 T.E. It was organised by Mr. Ganaprasad and the present writer with the objective of expressing gratitude and unstinted support to the beloved ruler for this remarkable act of benevolence and liberalization in the interest of the State and the people, and at the same time to enlighten the public opinion about Civic rights and responsibilities that are inseparably linked up with the acceptance, enjoyment and successful running of a reform. The warning is writ large in history that when due to ignorance people lacked political and Civic consciousness and thereby maintained an attitude of indifference or incapacity towards any measure aimed for their good, it has often been the case that either the interested and calculated opportunists took advantage to slip in and established their supremacy at the expense of the welfare of others or the forces of reaction retained status quo by thwarting the pious attempts of their generous rulers.

TEST BEFORE US

Janamangal proceeded on with its normal and peaceful activities with Mr. Sarma and the writer at the helm of its affairs who also have had to remain responsible to the ruler for making him acquainted with the moves and guidance of the organisation. The announcement of a forthcoming reform shortly to be followed by the emergence of Janamangal as a medium between the ruler and the ruled. espousing the cause of adjusting the relation between the ruler and the ruled by wiping away the Chinese wall of vested interests in the midway roused tremendous echoes from Caves, Forests, Fields, Towns, Villages and from everywhere possible. It was an awful as well as a startling incident never thought of be anyone. It surpassed even our expectation. It was as if a giant around from his agelong slumber by the touch of a magic wand and was roaring from acute hunger. Janamangal became the watchword of all our might, its call evoked overwhelming response, its voice reverberated even beyond the frontiers of the state, while it became a loesin to our opponents in as much as the mere touch of the bee alarmed of the demon of the mythology.

It was the beginning of renaissance, but a prelude to our danger. In the new awakening of the masses that marked the initial success of our movement almost prematurely were the germs of two opposed forces. The craddle of success and the grave of failure. In both the cases were involved, the question of actual leadership and the question of careful judgement.

In the light of subsequent events and judging from the place of my writing this article with all its attending influences around when I make a review of our policy connected with the Janamangal up till the occurrance of our detention, honestly speaking, it must be admitted that we failed to adjust ourselves with the critical situation and that should we have been careful of that sudden and unexpected storm in a calm teapot which unnecessarily frightened many and caused nervousness on others with the incidence of growing suspicion and fear of us, we could have rendered better service in the most easier way to the state, the people and ourselves. Unfortunately we became the object of hallucination, began to direct our activities from bad to worse calculations and, to speak the truth, it is the writer himself who knew well how the welfare, nay, the very existence of the infant movement in the state hinged on him, yet dominated by a hollow sense of martyrdom and hypersensitive leadership he inflicted the unkindest out on it. By the guest of popular passion, the standing character of which was questionable and the very nature of which spoke for itself as not to be relied more than it was worth, he forgot himself, his stand points, his aims, ambitions and everything, minimised the worth of cooperation, began to think in term of applying the higher principles of the Congress in a most rudimentary soil and lastly went to the extent of relinquishing his responsibility related to the ruler.

Different kinds of Opposition : Their Characters

It was already been stated that as the movement happened to win the confidence of the masses so earlier than was anticipated, there was corresponding suspicion, fear and opposition gradually taking shape on certain section of people. On analysis they seemed to have antagonised us on one or more of the following stand points :

1. These are men who seek public name in much the cheaper way as possible and hold the same until more qualified men come who can give what the former can not to the effect that the competents become the object of jealousy by the incompetents. Similar has been the condition

with us. We were looked down upon as intruders by those who owing to their superiority of complex could not tolerate our fall in the public estimation.

2. Those who could not hide their minds when they witnessed that we had fallen in the favour of the ruler who had been pleased to grant us audience whenever we sought it.

3. Those who were not actually hostile, but stood seemingly so to have access to the favour of the authority. They held that if they condemned Janamangal, Government would be pleased with them.

4. Those who actually feared us, but that was for their own interest. They apprehended that if the people became conscious and united, it would have disastrous effect on their position.

5. Lastly, there were those who sustained hostility owing to political rivalry as is evidenced from the quarrel between Janamangal and Ganaparishad.

Now a discussion is required to understand the devices which our opponents had adopted in the exhibition of their hostilities. Their technique, though not uniform, was directed, however, to the same end, e.g.

a) to alienate us from the confidence of the ruler,

b) to isolate us from the people,

c) to sow dissension among ourselves.

Below are given a few specimens of their technique.

A whispering campaign was launched propagating that Janamangal was a communal organisation under cover of democratic slogans fixing its eyes towards driving away a section of the people under popular indictment. This goebblian method was taken up specially by those who knew that they were much disliked by the masses, were looked down with contempt as "Strangers" by reason of their holding key positions in all the spheres of the state inspite of their hearths and homes not being here, were cursed for their apathy to the progress and prosperity of the people and were taken to mean that they have no disposition to voluntarily depart from this place of "endless exploitation" unless forced to go. Persons belonging to this section found that the ruler gave 'tacit approval" behind the movement and short of whose liberalism any step was impossible. Finding the name of the ruler associated with the watchword of Janamagal and being obliged to refrain from open hostilities these status quokers deeply resented the non-chalance of the ruler and simmered with faming discontent that the potential menace far from being ripped in the bud was rather growing in strength under the favour of the ruler himself.

Hand in hand with it another cunning arrow was selected with the object of undermining us in the estimation of the public. Pointing to our frequent interview with the ruler and indicating that both Mr. Sarma (President) and the writer (Secretary) served in the Publicity Department wishful interpretation was given that we were mercenary agitators. our secret design being to hoodwink the people in the interest of our personal ambitions, that we were holding false hopes simply to exploit them because Janamagal was a creation of His Highness himself who having apprehended trouble from elsewhere was taking precaution to forestall it in his own state, that the two leading figures of the Samity were more paid servants of the ruler with no capacity to act independently, that it was better to take one of the two imposters and that their misery would be all the more worse should they (People) be so unwise as to stick to them (Mr. Sarma & Mr. Roy) as their deliverer.

Another 'novel type of Warfare' employed against as consisted in charactensing Janamagal as the prototype of the Congress aiming at concerning the Govt. to concede what we want. The upholders of this view openly stated it in Tripura Patrika that coercive methods would be resorted to by us whenever these suited the convenience. So they indulged in advising the authority that it could be sheer imprudent if the attitude of the authority was not altered.

Just at this moment Mr. Sachin Sinha appeared on the scene with his Ganaparishad to make the matter worse. The man who only a few days ago was too reluctant to do any politics in Tripura State, his sudden advent in the arena of politics representing a separate organisation signified that he had come to render the felon purpose of the status quorum effective.

The Advent of Sinha : His pernicious procedure.

His conduct latter proved that our apprehension was not wrong. Posing to champion the Ramnagar men he thought the advisability that if he flung canards at us and challenged the administration for struggle he would be able to save them from eviction. Those who are closely acquainted with the affairs of Ramnagar must not still have forgotten how he chose a reckless procedure, embittered the minds of the villagers that we were lackies of the Ujjainta Palace, that we were deceiving them when we asked them for constitutional procedure, that we had instituted the evil suggestion to His Highness to deprive them of their hearths and homes, that we alone would be responsible if their properties were taken away at

sometime. However, we did all we had in our capacity to persuade him stating that whether he was not acting against the interest of the movement itself and whether he could withstand the blow that might come on the movement. That was in vain. He became all the more infuriated with us. Our advice rather amounted to throwing water on the boiling oil. Every meeting, every sitting, every acquaintance offered him the advantage of indiscriminate allegations against us and as far as can now be remembered, it may be said that his expendiency found satisfaction in humiliating the writer and Mr. Sarma before a public meeting at Rajnagar where the writer was made to sob bitterly just in the presence of police officers who took down everything and particularly that and perhaps not without relish.

Thus it was a time for us full of issues swinging in the balance. Hitterto we encountered no such crisis; all our sailing had been smooth. The achievement of some initial successes without going through difficulties left a wrong impression that the shape of things would continue to remain as easier as it had been. But when we thought in that manner, problems and obstacles were fast gathering before us. The movement had arrived at a decisive stage when obtainment of rights and demands relegated to the background before the vital problem of our existence. There was war in Europe; there was constitutional deadlock in the majority of the Provinces of India; there was persistent talk of direct action by the Congress; There were signs of unrest among the masses of our state; there was no lack of provocations by the official dom; there was division of rank among ourselves; there was pressure from inside and outside; the idea of militant action was in the air for the preservation of leadership; Mr. Sinha's group resolved to observe the Independence Day whereas the State authority promulgated Sec. 56 of the Defence of India Act. banning all meetings and procession except on the previous permission of the Mantri Parishad.

The situation was tense, but it was an acid test before us whether we could adapt ourselves to the changing circumstances and control the situation. It required from us and specially from the writer whether we had political foresight or are mere aimless tyros.

HISTORICAL BLUNDER

At this most critical juncture when everything was at stake and which might have been angled only by calm and well-judged actions compatible

with the demand of the situation we preferred the suicidal path. The heroic deeds of Manipur fired us with the flame of turning the Tripura State into a second Manipur; the triumph of the State's People movement had already left lively impression in our mind, our patience was at the breaking point by the impact of wild rumours; we felt the strong urge of some contraction to off set the allegations: tremendous response of the people allowed us to the belief that time had come to demonstrate the authority that they were with us; the appearance of Sachin, that mushroom magalomaniac, contesting our leadership bearing the false stamp of the congress and the idea that action was not being taken against him inspite of his subversive speeches led us to think that leadership could not be maintained unless some suitable moves were taken up by us to off set the mischievous canards; the delightful hope of finding our names with legendary glory in the different papers of Bengal was given precedence over the need of sticking to the original policy of Janamagal: we doubted the constitutional reforms that these would ever be implemented; lastly it was firmly believed that should we be clapped in prison following our precipitated action, the introduction of Dominion status would facilitate our release earlier.
Fed by all these misconceptions we decided to embrace a procedure which remained for ourselves to resent at a later date. To our regret we have come to see that we created problems to which we could not give solutions. The writer feels that it will be unfair if he omits to admit here that efforts were made to dissuade us from our ruinous adventure. His Highness himself in his historic proclamation in the 1st Baisakh of 1349 T.E. Stated, "I appeal to all to accept the rights and privileges announced with a full sense of responsibility and in the same spirit of goodwill in which they are granted and to give the reforms announced a fair chance, unhampered in their path of progress by any artificial opposition engendered in any quarter as might possibly in its turn force the hands of the Executive entrusted with the task of seeing them through, to adopt any drastic preventive action." When Maharaja Kumar Brajendra Kishore remained the President of the State Council during the absence of His Highness from the State on account of his journey in European Countries, he voluntarily sent for us and exercised his kind advice emphasizing that if we turned our energy to constructive programmes, which would produce better results than any political agitation could give, the goodwill and support of the State Govt. would not be wanting for us. He then made a cryptic hint that no Govt.. Can sit indifferent to unscrupulous political movements. When we were determined to stage non cooperation taking up the issue

of the failure of Janamagal in its sincere attempt to address a reception to His Highness on his auspicious arrival from Europe Mr. Sarma repeatedly requested that "to save Janamangal from imminent catastrophe if it is required that we should go a step backward, we ought to accept the situation in the spirit of Gandhiji's position." But the tempo of our youthful sentiment had risen to such a light that all these valuable suggestions were not only cold-shouldered, but they were labelled as coward reactionaries. Thus if Sachin conspired for the premature death of the movement, we carried the doom all the move earlier. The "Hasam Bhojan" episode and my "resignation affair" have substantiated this well. At that time we calculated that these were the best policies in keeping the leadership in fact, in disappointing the "Goebblian Propagandists" and in demonstrating that "Tripura is no less unimportant than Manipur and other Indian States in struggle.

LESSONS FROM PRISON

Now the question arises within ourselves, what has accrued from these hasty, unscrupulous and ill conceived actions? Have they delivered good to us or eliminated our achievements?

The answer is too unpleasant. To our disappointment and bitter remorse we rather find that the leading members of the movement have either been externed or thrown into prison: all activities have been reduced to a standstill: the annoyance of the ruler knows no bounds: there is left not a vestige of life to indicate the existence of Janamangal: There is none to represent to His Highness on behalf of the people. As days went by the lamentable experience downed on us that the much talked of Dominion Status has not been granted: there is no hope of an earlier termination of the war, which is rather assuring menacing aspects: the non-cooperation policy of the Congress has proved in effective, because it is half hearted; Gandhiji instead of hastening crisis in the disaffected states imposed the programmes of constructive activities on the country: the communal virus has risen to crescendo the movement of Irabat Sing, that we wanted to emulate has itself collapsed: the ignorant masses of our state who rose into excitement so rapidly and created in us a hollow impression of strength relapsed into cold passivity; and above all we came to see to our horror that indefinite imprisonment which we never contemplated has been thrown at us. In this way our enforced seclusion together with the heaviest burden

of imprisonment opened our eyes to realise that all our considerations and conclusions have either been shattered or bore unimaginable results as disastrous as may be.
To every action there is a reaction. In our cramming system of education it has often been the case that we learn of a phrase by memory while we have passed over its actual meaning. But at times occasion arises when one can fully grasp the significance of a dictum when it synchronises the tragedy of his own life. He realises it, because there is no escape from it. Such has been the case with us since our imprisonment there has naturally followed a reaction capable of reviewing and judging our past actions in the light they deserve and of impelling us to seek answers to the following questions : whose fault? Is it the fault of the Executive or the fault of ourselves for our incarceration? Are these days not in vain? What interest is subserved in relation to the state, the people and ourselves if we continue to remain behind the prison bars with a frivolous sense of popularity and martyrdom? Would it not have been wiser have we had that commonsense to remain outside and preferred the sympathy and kindness of the ruier under whose protection leadership is enduring? We put blame on Mr. Sinha for having played the record fiddle into the hands of our antagonists, but are we free from this charge? The vast field of opportunities that we have flagrantly trampled down instead of using in a business like manner and which seldom appear in the lives of men, would these come again? I was afraid of losing my leadership and held that "two edged sword". "lackey of the Ujjainta Palace," "imposters," hired agitation," all these humiliating allegations resulted from my relation with the Publicity Department and that it must be severed; would it not have been better if I want to His Highness and explained the matters away in detail? Or what crime it would have been, if I had gone to Raja Saheb and exhorted the diplomatic necessity of our imprisonment? There is no absence of evidence that in some places people have had to lose their lives even to obtain the right of holding meetings or forming organisation and has not our ruler displayed that generosity by allowing us free organisation and free meetings? Is it unknown that till he had reason to suspect our movements all our public meetings were conspicuous even by the absence of plain clothes police officers? There has been a rumour that the promised reforms have been kept in abeyance and the pronouncement of it was mere a piece of propaganda; but has not our well principled ruler strongly repudiated the vile rumours by emphatically, reiterating that, "all outstanding measures (of reforms) will be pushed on vigorously inspite of *all difficulties that*

may stand in the way? All these questions come streaming in, demand solution from us, and centre round an original question : What is to be done now to get the above "Himalayan" blunders rectified?
The only reply we get to the satisfaction of our conscience consist in the slogan of loyal "Cooperation, Constructive Programmes and Constitutionalism". The answer when analysed may be arranged in the following way :

1. The circumstances vividly represent that every political thinker of this State should recognise the necessity of Constitutionalism under the unfeigned leadership of the ruler.
2. That solicitations brings hundred things where agitation fails and where solicitations is a bliss, it is fully to agitate;
3. That loyal cooperation is infinitely preferable to unscientific and unconscious movement which only defeats the objective;
4. That in this world of diverse interests there should be no question of martyrdom in the world of politics and that all our actions should henceforth be dominated by the singular idea, with whom we should be aligned though there may be semblance of contradictions;
5. Whoever would be imprudent to oppose this historic necessity must have to be reduced to nonentity whatever may be his status;

PREFACE

Here is an article containing the full expository statement connected with the declaration that has been made by us and endorsed in the release petition of 17.02.51. On the last New Year's Day when it became possible for me to respectfully address a sincere and humble greeting to His Highness I rendered the solicitations that " I am eagerly looking forward to the fortunate day when I would be able to lay down the lyric cries of my heart before the greatness of His Highness". This article is the symbol of my attempt to perform the sacred undertaking and is earnestly written to present it to His Highness on the auspicious occasion of his birthday anniversary.
I have not the least idea about the view that may be taken from the study of this article. Only the Almighty knows whether I may have the luckin making it gone through by my kind and illustrious reader. But it can be emphatically stated that it is written from clear conscience. where my political thoughts, constructive ideas and all the details of my personal experience have been honestly represented, there may be places in this

article where difference is not only not unexpected. but where reminiscence of bitter accounts is apprehended; but it is also eagerly hoped that the keynote of this witting will not be lost sight of before the moments of acrimonious memories which may be recalled in the course of this article. "Forget, Forgive and Save in the tenor". No repetition of youthful blunders" is the solemn assurance and "Strict adherence to loyal cooperation and Constitutionalism" is the cardinal principle of this statement. It is a faithful reflexion of our views and ideas as they had been before our detention and as they have become under educative circumstances here.

21st Sraban, 1351 T.E. PRABHAT CHANDRA ROY.
Wednesday.

Historical Blunder

At this most critical juncture when every thing was at stake and which might have been averted only by calm and well-judged actions compatible with the demand of the situation we preferred the suicidal path. The heroic deeds of Manipur fired us with the flame of turning the Tripura State into a second Manipur; the triumph of the States' peoples' movement had already left lively impression in our minds; Our patience was at the breaking point by the impact of wild rumours; we felt the strong urge of some counteraction to offset the allegations; the tremendous response of the people allured us to the belief that time had come to [illegible] authority that they were with us; the

প্রভাত রায়ের হস্তলিপি

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের ইতিহাস

সবুজ সমিতি — কর্ত্তা ও ঠাকুর দিগকে লইয়া। সভাপতি লালুকর্ত্তা ও দুর্জ্জয় কর্ত্তা। সামাজিক গণ প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের মধ্যে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট দাবী ও কার্যক্রম গ্রহণে অপারগতা, পাছে সরকার বাহাদুরের সন্দেহ ও বিরাগোদ্রেক হয় তজ্জন্য আশঙ্কা, সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্বের হেতু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া সন্দেহাতীত। তথাপি এই গণ আন্দোলনের উহাই প্রথম ভিত্তি।

উপর্যুপরি নোটিশ ও গাড়ী পাঠাইয়াও যখন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মেম্বারগণ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন তখন সমিতি অচল হইয়া পড়িল। দুয়েকদিনের হুজুগে মাতামাতি নির্লিপ্ততায় পরিণত হইল। সমিতির নিমন্ত্রণ অনেকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল । মহারাজ কর্তৃক অনুমোদন লাভ দ্বারা তাহাদের ভয় ঘুচিল সত্য কিন্তু interest চলিয়া গেল।

জনমঙ্গল সমিতি — রাজবন্দী গণ একে একে মুক্তি হইয়া গেল। অধিকাংশের দৃষ্টি রাজ্যের বাহিরে কাজ করা। এমন কি সবুজ সমিতি তাহাদের জন্য ভিত্তি ভরসা করিয়া রাখিলেও অনেকে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইল না। যে দুয়েকজন রাজ্যে কাজ করিতে চাহিল তাহারাও সবুজ সমিতির মধ্যে কাজ করিতে না চাহিয়া অন্য একটি সমিতি গঠন করিবার জন্য ধুয়া তুলিল। মোট কথা দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন করা যে কত বিপজ্জনক — এবং আবরণ ব্যতিত যে ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যাইবে না তাহা কেহই বুঝিতে চাহিল না। একমাত্র অনন্ত দেই প্রথম হইতে সমর্থন দিয়াছিল।

শিলং হইতে মহারাজ শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিবার ইঙ্গিত দিলেন। সেই সুযোগে ১৩ই ভাদ্র ... দুর্গাবাড়ীতে, ব্রজগোপাল ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে, কমিশনার, চীফ জজ, রেণু সাহেব প্রভৃতির উপস্থিতিতে সর্ব্বসাধারণকে লইয়া সভা হয়। অবশ্য সেই সভায় ছাত্র ও শহরের লোকজনই বেশী ছিল। তথাপি সবুজ সমিতির যুগ হইতে ইহা বিদায় গ্রহণ করিল বলিয়া স্পষ্টই বোধ হইল।

বুর্জ্জোয়া ও গণ সংমিশ্রণ — এই সভায় বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার পরই অতিদ্রুত বেগে আমরা গণসংযোগমুখী হইয়া পড়ি। ২৮শে ভাদ্র খোসবাগে স্থানীয় উকীল আব্দুল আজীজ মুন্সীর সভাপতিত্বে সভা হইলেও সেই সভায় শতকরা ৯৫ জনই কৃষক উপস্থিত হয় । এই জনসংমিশ্রণের ফলে ১৩ই আশ্বিন কৃষকদেব মধ্য হইতে চারু সর্দ্দারকে সভাপতি করিয়া খোসবাগানে বিরাট সভা করা হয়। এই সভায় অন্যান্য বিভাগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বক্তৃতা করেন সর্ব্বসম্মতির উপর কতকগুলি প্রস্তাব পাশ হয়। তন্মধ্যে সমিতির গঠনতন্ত্র আলোচনা অন্যতম।

১৩ই ভাদ্র হইতে ১৩ই আশ্বিনের মধ্যে আশাতিরিক্ত ভাবে গণসংস্পর্শ লাভে সমর্থ হইয়া থাকিলেও স্বেচ্ছায় কতকগুলি কাজ করিতে হয়। (এক) প্রতি সভায় মহারাজের জয়ধ্বনি। (দুই) কর্ম্মচারীদের উপর দোষারোপ। (তিন) শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের কুশলী ব্যাখ্যা। কারণ (১) গণসংযোগ লাভের

সাফল্যে সরকার যেন ঘাবড়াইয়া না যায়, (২) কর্ম্মচারী দিগকে দোষারূপ করিলে প্রজাগণ খুশী হইত এবং সমিতি সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দলে দলে যোগ দিতে বলিত। কর্ম্মচারী বৃন্দের সঙ্গে মহারাজের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমাদের চাতুর্য্যে মহারাজ ইহার জন্য আমাদিগকে কিছু বলিতে না পারিয়া পরোক্ষে উৎসাহই দিতেন। আমরা জানিতাম কর্ম্মচারীর উপর আঘাত অদূরে মহারাজের উপরই পড়িবে। (৩) শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের কথা বলিতে গিয়া প্রকারান্তরে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার গলদ ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা আনয়নের জন্য আন্দোলনের প্রচার করা হইত।

গঙ্গা প্রসাদ বাবুকে শিখন্ডী স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া মহারাজকে অন্যরূপ বুঝাইতে হইত এদিকে প্রজা আন্দোলন উভয় সামঞ্জস্য রক্ষামূলক অগ্রসর হইতে থাকা।

কিন্তু অতিরিক্ত নেতৃত্বলোভী শচীন সিংহ আমাদিগকে প্রতিদ্বন্দী মনে করিয়া "গণ পরিষদ" নামে সমিতি আরম্ভ করিল। বংশী ঠাকুর যেখানে ২০শে ভাদ্রের সভায় পূর্ব পাড়াতে আব্দুল আজীজ মুন্সীর সভাপতিত্বে স্বতন্ত্র সমিতি গঠন না করিয়া জনমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইল, শচীন সিংহ আত্ম নেতৃত্ব রক্ষার্থ আন্দোলনকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। তাহার টার্গেট হইল গঙ্গাপ্রসাদ ও প্রভাত রায়। গঙ্গাপ্রসাদ ও প্রভাত রায় চাতুরীর আবরণে গণ আন্দোলনের পথ সহজ করিয়া দিতেছিল। আলোচনার মধ্যে ইহার কর্ম্মোপলব্ধি করিয়াও এবং বারংবার সম্মিলিত ফ্রন্টের জন্য অনুরোদ্ধ হইয়াও তাহাকে সম্মিলিত ফ্রন্টে পাওয়া গেল না। বরং তাহার মুখে আগ্নোৎপীড়ন আরও প্রবত্ত হইল। যেন আমাদিগকে বকিলেই দায়িত্বশীল শাসন লাভ হইয়া যাইবে।

রামনগরের ব্যাপারে আমাদের জনৈক কর্মীর ছুটি হয়। সেই ছুটির সুযোগ লইয়া প্রতিদ্বন্দী শচীন সিং প্রজা আন্দোলনের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়। অপ্রস্তুত জনসাধারণকে সাময়িক উত্তেজনার পথে লইয়া যাইতে থাকে। এবং সঙ্কীর্ণ কর্ম্মপদ্ধতিতেই সাফল্যের স্বপ্ন দেখে।

রাজ্যের সর্বত্র বিভাগীয় ও শাখা সমিতি গঠনের জন্য আমাদের সফর। সরকারের অস্বস্তি ও গোপন নোটিশ। ব্যাপক করার চেষ্টা ব্যাহত হইবার উপক্রম হয়। পত্রিকায় অতি রঞ্জিত সংবাদ প্রকাশের জন্য।

শচীন সিং আমাদিগকে এক অদ্ভুত অবস্থায় লইয়া যাইতে থাকে। আমাদের পক্ষে রাজকার্য্যে থাকিয়া কাজ করা অসম্ভব বোধ হইতে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে দ্বিধার সঞ্চার হয়। মহারাজের জয়ধ্বনি দেওয়া ও কর্ম্মচারীগণকে নিন্দা করা অসমীচিন হইয়া দাঁড়ায়, সাক্ষাৎভাবে শাসন ব্যবস্থাকে *আক্রমণ করিবার মত মনোভাব পোষণ করিতে হয়।* নতুবা জনসাধারণের মধ্যে অগ্রসর হওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে।

অথচ অনেক কাজ বাকি। রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনের প্রয়োজন, অফিসের প্রয়োজন — শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্বাহক পরিষদ গঠন প্রয়োজন, পত্রিকার প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ প্রয়োজন। যদি শচীন সিংহের মতো কাজ করা হয় তবে তম্মুহূর্তেই গণ আন্দোলন ধ্বংস হইবে।

একদিকে শচীন সিংহের তর্জ্জনের ধাক্কা অন্যদিকে অসমাধিত কাজ এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া হতবুদ্ধি

হইবার উপক্রম হইল। তথাপি অনেক চেষ্টায়, পুলিশের তীব্র বিরোধিতায় গণ পরিষদের মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও ১৩৪৮ সনের (ত্রিং) ৩/৪ তারিখ কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন হয় এবং ৫ তারিখ রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও সেক্রেটারী প্রভাত রায়। প্রায় ৪০০০ লোক সভায় উপস্থিত। শতকরা ৯৮ জনই পাহাড়িয়া। ফটো গ্রহণ ও পত্রিকায় মুদ্রণ হয়।

১৮/১৯/১০ই চৈত্র ১৩৪৮ ত্রিং ধর্ম্মনগরে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে "প্রজার কথা" নামক পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব হয় এবং জনমঙ্গলের দাবী কি তাহা স্থির হয়। 'প্রজার কথা' এক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াই বন্ধ হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সমিতির প্রতি সরকারের মনোভাব কঠোর ভাব ধারণ করে। ১৩৪৮ ত্রিং এর ৫ই ফাল্গুনের সভার জন্য শ্যামাচরণ কবরা আলাং আটক থাকে। ইহার পর বীরেন দত্ত রাজ্যান্তরিত হয়। অনেক চেষ্টার পর বীরেন দত্তকে ফিরাইয়া আনা হয়।

দত্তকে ফিরাইয়া আনার জন্য বিরোধী দলেরা অপপ্রচার করিবার প্রচুর খোরাক পায়। জনমঙ্গলকে রাজার সমিতি হিসাবে সর্ব্বসমক্ষে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়।

আন্দোলন করার ফলে রামনগর এখন পর্যন্ত খাস হইলেও প্রজাগণকে উচ্ছেদ দেওয়া হয় নাই। ১৩৪৯ ত্রিং এর ১লা বৈশাখ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পুনর্ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তাহার সোপান স্বরূপ গ্রাম্য মন্ডল প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কর্ম্মচারীগণকে ঘুষ প্রভৃতি না লইতে সাবধান করিয়া দেওয়া হয। সদরে গ্রাম্য মন্ডল প্রবর্ত্তন শুরু হইয়াছিল। কিন্তু incharge, কর্ম্মচারীর অপারগতায় ও জনসাধারণের অপ্রস্তুতির জন্য অন্যান্য হিতকর কার্য্যের ন্যায় ইহাও শোচনীয়ভাবে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত লাভ করে।

ইতিমধ্যে জনমঙ্গল সমিতির মধ্যে আত্মকহল উপস্থিত হয়। ত্রিবেদী ও বণিক বিভাগীয় antonomyর জন্য হৈচৈ লাগাইয়া দেয়। এবং কেন্দ্রীয় সমিতির মেম্বার হইয়াও কেন্দ্রীয় সমিতির উপর দোষাবোপ করিতে থাকে। অবস্থা না বুঝিবার জন্য অথবা তাহাদের স্বতন্ত্রী মনোবৃত্তির জন্য আন্দোলনের গতিবেগ মন্থর হইতে থাকে। ত্রিবেদী সদরের লোকজনকে বিভিন্ন বিভাগে সফর করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে, কিন্তু তাঁহাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। বণিকেরও একই অবস্থা। তবে বণিক ও ত্রিবেদীর মধ্যে পার্থক্য আছে। ত্রিবেদী মোটেই রাজনীতি বুঝিতে চাহে না। কৃষকগণ ধর্ম্মনগর বিভাগে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করিতে চাহিলেও গোপালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি প্রচার ও কার্য্য দ্বারা জনগণের দৃষ্টি সংস্কারমুখী রাখিয়া নিজ নেতৃত্ব বজায় রাখিতে সর্বতোমুখী সচেষ্ট হন। অন্যদিকে বণিক অপেক্ষাকৃত রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থা না বুঝিতে পারিয়াও বুঝিতে পারার আত্মবিশ্বাসকে আন্দোলন ক্ষেত্রে ভুল করিয়া বসিল। কেন্দ্রীয় সমিতিকে অবহেলা করিয়া ডিভিশনের দায়িত্বেই জনমঙ্গলের দাবী মুদ্রিত করিয়া বসিল। ইহার ফল ভালই হইল। কেননা জনমঙ্গলকে ইহা জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভে সুযোগ দিল। কিন্তু পদে পদে স্বাতন্ত্র রক্ষার ভাব ও আমাদের সঙ্গে আলোচনার অভাব এবং প্রজাসাধারণকে ব্যাহত করিল অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে আলোচনার অভাব এবং প্রজাসাধারণকে over-dose দেওয়ার চেষ্টা মূল

আন্দোলনকে ব্যাহত করিল অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া তিনি আস্তে আস্তে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অথচ তিনিই কৈলাসহরের একমাত্র কর্ম্মী। তিনি তাঁহার দলকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন, না পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

স্বাধীনভাবে কৈলাসহরে কেন্দ্রীয় বৈঠক আহ্বান ত্রিবেদী ও তাহার দল ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের অনুপস্থিতি আমাদের প্রতি বণিক ও ত্রিবেদীর ক্রোধ। ত্রিবেদী রহিল, কিন্তু বণিকের কোন সংবাদ মিলিল না। বণিককে অনেকবার চিঠি লিখা হইল। কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না।

বিভাগগুলির এই স্বাতন্ত্রী মনোভাব দেখিয়া সদরের প্রতি আমাদের মনোনিবেশ। দত্তের পরামর্শানুসারে সদরের সর্বত্র শাখা সমিতি গঠন চেষ্টা। জিরানীয়া, মোহনপুরে শক্তিশালী সমিতি গঠন। শাখা সমিতি সমূহের নিয়মাবলী মুদ্রণ।

রাজনীতির বাস্তবতার দিক দিয়া আমরা কেহই অভিজ্ঞ না হইলেও আমাদের মধ্যে দত্তের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সমিতির কাজে লাগিবার দিক দিয়া প্রশংসনীয়। রাজ্যের সর্ব্বত্র শাখা সমিতি বিস্তার, কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন, পত্রিকা বাহির করা, সমিতির কার্য্যাবলী, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ, প্রভৃতিতে দত্তের দান অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু অনেক দোষও আছে। তন্মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে অতিরিক্ত বর্ণনা শ্রেণীগত সংগ্রামের মনোভাব, অসময়ে প্রকাশ, কাজের সময় সহসা অন্তর্ধান — অতিরিক্ত সুবিধাবাদী। দত্ত যদি নিজের চিন্তার সহিত কাজের খাপ খাওয়াইতে পারিত তবে প্রজা আন্দোলন অনেক ব্যাপকতর হইতে পারিত।

তবে প্রথম অসহায় দত্তের পক্ষে কাজ করিবার অসুবিধা যে না ছিল তাহা নয়। দত্তের বামপন্থী মনোভাবের জন্য দক্ষিণ পন্থী গণের পক্ষে তাহাকে ভয় করিবার কারণ ছিল । সেই জনাই গণসংযোগের পক্ষে দত্তের সুবিধা হয় নাই। কিন্তু সুযোগ যখন কিছুদিন পর আসিল তখন দত্তকে সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে দেখা গেল না। নতুবা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দত্তের ন্যায় ক্ষমতাশীল লোক নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ দত্ত যখন কাজ করে তখন সকলকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন।

উত্তর বিভাগগুলির সহিত মতানৈক্য দেখা দিলেও দক্ষিণ বিভাগগুলি হইতে আহ্বান আসিতে থাকে। কিন্তু উদয়পুরের কর্ম্মীগণ অধিক দূর অগ্রসর হইতে নারাজ হওয়ায় অর্থাৎ মহারাজের অনুপস্থিতি সময়ে সভা করিতে অস্বীকার করায় প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুরকে বাধ্য হইয়া উদয়পুর যাওয়া স্থগিত করিতে হয়। সংস্কারপন্থীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার ভাব উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হয়। দত্ত প্রদর্শনেই তাহারা পলায়নমুখী হইয়া পড়ে।

আমরা নিজেদের আন্দোলন সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলাম। আমাদের নিজেদের ও জনগণের উচ্ছ্বাসটিকেই গণ আন্দোলন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দত্ত আমাদিগকে বারংবার ক্যাডার সৃষ্টি করিতে বলিলেও আমরা তত গুরুত্ব প্রদান করি নাই। অথচ concious element ছাড়া আন্দোলন কখনো ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে না। চলাচলের অসুবিধা, নিজেদের অনভিজ্ঞতা, জনসাধারণের ভীতি ও সঙ্কোচ মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে আন্দোলনে রূপায়িত হইতে চাহিয়াছিল মাত্র । তবে দেড় বৎসরের মধ্যে আরও অগ্রসর হওয়া যাইত যদি স্থানীয় কর্ম্মীগণ

সকলেই শক্তি অনুযায়ী steadily কাজ করিত ও গণপরিষদ ও জনমঙ্গলের মধ্যে দলাদলি না থাকিত। দলাদলিতে প্রজা সাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে demoralisation আসিতে থাকে। স্থানীয় কর্ম্মীগণের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎভাবে বাহিরের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত তাহারা এখানে কাজ করিলেও বাহিরের সংগ্রামমুখী ভাবধারা ও আন্দোলন দ্বারা স্থানীয় আন্দোলনকে চালিত করিতে চাহিত। তাহারা বুঝিতে পারিত না যে চিন্তার দিক দিয়া আমরা বিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করিতে চাহিলেও, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা সাধারণ এখনও ১৫০ বৎসর পিছাইয়া আছে। আন্দোলনকে সংগ্রামাত্মক করিয়া তুলিবার কতকগুলি স্তর আছে। সেইস্তর বাদ দিয়া যদি প্রথমেই Top slogan দেওয়া হয় তবে জনগণ অপ্রস্তুত থাকিয়া যায়। যুদ্ধের জন্য আমরা অতিরিক্ত সংগ্রামমুখী হইয়া পড়িয়াছিলাম সত্য। কিন্তু নিজেরা যদি ব্যস্ত না হইয়া পড়িতাম এবং শচীন সিং যদি তাহার হঠ রাজনীতি দ্বারা আমাদের উপর চাপ না আনিত তবে হয়ত সরকারের সঙ্গে এত সহজে বিরোধ আসিত না। আমাদের ব্যস্ত হইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বাহিরের চাপে ব্যস্ত হইতে বাধ্য হই। অভিভাষণের অর্থ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা হয় এবং ছাত্রগণকে স্বাধীনতা দিবস পালন করাইবার চেষ্টা করানো হয়। ফলে ৫৫ ধারা জারী হইয়া পড়ে। গ্রেপ্তার হইবার মত এমন কোন কাজ আমরা করি নাই। তবে শচীনের চাপে ৩৫, টাকা ছাড়িতে বাধ্য হই। যদিও জানিতাম যে ইহা ছাড়ার অর্থ গ্রেপ্তার অথবা অন্তরীন। তাহাই হইল। আরও দেড় বৎসর পর যাহা হইত দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাহাই দাঁড়াইল।

এই আন্দোলনের মধ্যে আরও কিয়ৎকালের জন্য বুর্জ্জোয়া প্রাধান্য এবং আরও বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর লোককে রাখা উচিত ছিল এবং এত অল্প সময়েই crisis precipitate না করিয়া সরকারের সঙ্গে আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়া আরও কিছুকাল আপোষের চেষ্টা করা উচিত ছিল। ত্রিপুরা সরকারকে একেবারে দোষ দেওয়া যায় না। অনেক দেশীয় রাজ্যের তুলনায় এখানকার সরকার অপেক্ষাকৃত উদার বলিতেই হইবে। যদি ইহা না হইত তবে আমাদের কাহারও পক্ষে আন্দোলন করা অসম্ভব হইত। কিন্তু দেড় বৎসর আন্দোলন করিতে পারিয়াছি।

ব্যক্তিগতভাবে মহারাজকে যতদূর জানি তাহাতে Reformist আন্দোলনকে চলিতে দিতে রাজী ছিলেন। অনেক রাজাই যাহা করিতেও নারাজ। সংগ্রামকে আমি ভয় করি না; তবে সংগ্রামের অবস্থায় না উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত শক্তিলাভ ও আত্মরক্ষার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিবার পক্ষপাতি। এই জন্যই আমি গঙ্গাপ্রসাদকে সমর্থন করিতাম। সমিতির উপর সরকারের রোষ আসিবার প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছিলেন যদি কিছু না করিয়া সমিতি অস্তিত্ব বজায় রক্ষা করা যায় তবে তাহাই শক্তিশালী বলিয়া বুঝিতে হইবে। গঙ্গাপ্রসাদ সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাহার চেষ্টাকে আমরা যতদূর নষ্ট করিয়াছি প্রজাগণ ততটুকু নষ্ট করে নাই। দেখা গিয়াছে কর্ম্মচারীদের উপর তাহাদের যত বিতৃষ্ণা মহারাজের প্রতি তদ্রূপ নহে।

ছাত্র আন্দোলনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় নাই। শ্রমিকদের প্রতিও নহে। বাহিরের কোন নেতৃস্থানীয় লোককে এখানে আনিবার চেষ্টা হয় নাই। নারী আন্দোলনের জন্য একজন নারী নেতার আগমন হওয়া দরকার ছিল। ভলান্টিয়ার করা দরকার ছিল। চাকলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা

করা দরকার ছিল।

জনমঙ্গল সমিতির মধ্যে যাহারা যোগদান করিয়াছিল তাহারা যোগ্যতাসম্পন্ন।

ভবিষ্যতে গণপরিষদ ও জনমঙ্গলের এক হইবার সম্ভাবনা আছে।

২

যে সকল কর্ম্মীগণ বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান জন্য প্রজা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের জন্য একদল রাজ্যান্তরিত, অন্যদল সদর জেলে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আবদ্ধ। আমাদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া যাহারা আশা করিত যে অবস্থার উন্নতি হইবে, অথবা যাহারা ধারণা করিয়াছিল যে আন্দোলন দমন করিতে গেলে গোলমালের সৃষ্টি হইবে, কার্য্যত তাহা না হওয়ায়, তাহাদের পক্ষে নিরাশা হওয়া কিম্বা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমাদের জেলে আসার ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে, আরও কতদিন চলিবে বলা যায় না। ইহার মধ্যে জনমঙ্গলের প্রচার সম্পাদক আইন অমান্য করিয়া রাজ্যে প্রবেশ করায় ১ বৎসর ৩ মাস কাল দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নীরদ ভট্টাচার্যকে হাজতে আনা হইয়াছিল। তিনি মুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোনপ্রকার আন্দোলন কিম্বা রাজনৈতিক সভা সমিতি হইতেছে না তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র আমাদের জেল প্রবেশের কিছুদিন পর শোনা গিয়াছিল যে ধর্ম্মনগরে হরতাল চলিতেছে, কৈলাসহরে সভা সমিতি হইতেছে এবং সদরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া খোসবাগে সভা হইয়াছে। অন্যত্রও বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। প্রজারা আমাদের গ্রেপ্তারে ক্ষুব্ধ হইয়া মুক্তির দাবী জানাইতেছে। বৃটিশ হইতেও প্রতিবাদের ধূঁয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎপরই অবশিষ্ট কর্ম্মীদের উপর কড়া নোটিশ জারী হওয়ায় উদীয়মান চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ, শক্তির অভাবে এলাইয়া পড়ে। এখন আর কোন কিছু শুনা যাইতেছে না। হয়ত আর মুক্তির দাবীও হইতেছেনা।

তবে কি বলিতে হইবে যে আন্দোলন করিয়া কোন ফলই হয় নাই ? তবে কি বলিতে হইবে যে আন্দোলন যাহা একটু ছিল তাহা মরিয়া গিয়াছে? আমরা কি তবে না বুঝিয়া না শুনিয়া দুয়েকদিনের জন্য একটা হৈচৈ করিয়া জেলে আটক হইতেই আসিয়াছি ? যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে কোন কিছু হইবার আশা নাই। অবশেষে কি তাহাদের কথাই ঠিক হইল? সরকারী আদেশে বলা হইয়াছে দ্বিরাদেশ তরে অথবা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কয়েদী ভাইরা পর্য্যন্ত বলে যে দলে দলে আসিয়া প্রজারা আমাদের সঙ্গে জেলভর্ত্তি করিবে। ইহাই তাহারা আশা করিয়াছিল। এসকল কথা আমরা অস্বীকার করি না এবং অন্যেরা যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের অন্ত থাকিত না। কিন্তু আমরা কতদূর কি করিয়াছি এবং যাহা হয় নাই বা করিতে পারি নাই তাহা কি কারণে হয় নাই তাহা আমরা যতদূর জানি অন্যের পক্ষে জানিবার ততদূর সুবিধা হয় নাই। তাই অন্যেরা যাহা দেখিতে বা হইতে চাহিয়াছিল তাহা না হওয়ায় দুঃখিত বা নিরাশ হইলেও আমরা তাহা হই নাই। ইহার কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমরা করিয়াছি এবং যতদূর করিয়াছি তদনুসারে ফলও পাইয়াছি। এ রাজ্যের মধ্যে আমাদের চেয়ে প্রবীণ, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ, ও বিদ্বান লোক থাকিলেও আন্দোলন ক্ষেত্রে একমাত্র নিজেদের শক্তি সামর্থ্য, বুদ্ধি ও চিন্তার উপরই

আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শ্রেণীকে টানিলেও তাহারা দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করিয়াছে এবং যে দুয়েকজনকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহারা যে রূপ সুবিধাবাদী, নেতৃত্বলিপ্স ও স্বার্থন্বেষীর ভাব দেখাইয়াছিল তদ্রূপ আন্তরিকতা যা সহযোগিতা মোটেই প্রদর্শন করে নাই। উপরন্তু আন্দোলনকে পিছে টানিয়া রাখিতেই তাহারা সচেষ্ট ছিল। তাই সরকারের দিক হইতে যখন আন্দোলনের উপর চাপ আসিল তখন আমাদের দোষত্রুটি দেখাইয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে নাই। তাহাদের এই ডিগবাজী আন্দোলনের বিরোধিতায় শর্তহীন সহযোগিতায় পর্য্যবসিত হইল।

ইহা ভুলিলে চলিবে না যে আমরা মাত্র একটি বৎসর কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে কোন বিভাগে একবার, কোন কোন বিভাগে দুইবারের বেশী সফর করিতে পারি নাই। জনসাধারণের অক্ষমতা, রাস্তাঘাটের অভাব, যাতায়াতের অসুবিধা, অর্থাভাব, নিজেদের অনভিজ্ঞতা, কর্ম্মীদের ত্রুটি বিচ্যুতি, সরকারের বিরোধিতা, উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব প্রভৃতি বহু বাঁধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া মাত্র একটি বৎসর আমরা কাজ করিতে পারিয়াছি। ইতিমধ্যে কতবার যে অসুখে পড়িয়াছি এবং হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়াছি তাহার হিসাব নাই। ভাষাজ্ঞান না থাকার দরুণ মাত্র ২ / ১ জন ছাড়া পাহাড়ীয়াদের মধ্যে আর কেহই যাইতে পারে নাই।

এইরূপ গণসংযোগ ও প্রচারের অসুবিধা এবং বহু বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা জনসাধারণকে নিকট হইতে আশাতিরিক্ত সাড়া পাইয়াছি। কমলপুরের সভা ও খোসবাগের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে লাঠিধারী পুলিশের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষকগণ দলে দলে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সভায় যোগদান করে। খোসবাগের সম্মেলনে বৃটিশ ও স্টেটের লোকজন লইয়া প্রায় দুই হাজার শ্রোতা হইয়াছিল। এই সম্মেলনেই শ্যামাচরণ কোবরাকে গ্রেপ্তার করিয়া আলংবন্দী করা হয় অর্থাৎ আন্দোলনের প্রথম হইতেই ইহার উপর সরকারের চাপ দেওয়া হয়, সেই চাপ যেকোন শিশু আন্দোলনের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বাহিরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত রাজনৈতিক আন্দোলন করা যে কিরূপ দুষ্কর, দেশীয় রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যাহাদের জানা আছে একমাত্র তাহারাই আমাদের অসুবিধা বুঝিতে পারিবে। যতটুকু ধৈর্য্য, নির্ভীকতা, বুদ্ধিসত্তা ও কার্য্যকুশলতার প্রয়োজন, আন্দোলন করিতে গিয়া একথা আমরা ভুলি নাই। কৃষকগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা যাহাতে পুষ্টিলাভ করে এবং তাহারা যাহাতে প্রতিকার লাভের জন্য সংঘবদ্ধ হয়, উক্ত মতবাদ প্রচার করার মধ্যেই একটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। স্থানীয় অভাব, অভিযোগ লক্ষ্যকে লড়াই করিবার সুযোগ একমাত্র রামনগরেই ঘটিয়াছে। তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রজাদের মধ্যে আলোড়ন আসে এবং তাহারা সমবেতভাবে আইনের ভিতর দিয়া অভাব অভিযোগের প্রতিকার ও দাবী পূরণের জন্য দরখাস্ত ও দরবার করিতে থাকে। তাহাদের এই একত্র হইয়া কাজ করিবার ভাব দেখিয়া সরকার বিচলিত হইয়া পড়েন। গ্রাম্যমন্ডল, শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি দেওয়া হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘোষণা দেওয়া হয় এবং রামনগরের খাস ও স্থগিত রাখা হয়। ডুকলী, মলয়নগর, প্রতাপগড় প্রভৃতি বন্যহস্তী উপদ্রুত অঞ্চলের দুঃস্থ অধিবাসীরা দলবদ্ধভাবে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থীরা সাহসের সহিত দুরবস্থার প্রতিকার প্রার্থনা করবার